ভূয়োদর্শন

বনফুল

বেঙ্গল পাবলিশার্স
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে ষ্ট্রীট, কলিকাতা

তিন টাকা

দ্বিতীয় সংস্করণ—ফাল্গুন ১৩৫৩

প্রকাশক—শ্রীশচীন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়
বেঙ্গল পাবলিশার্স
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে ষ্ট্রীট

মুদ্রাকর—শ্রীশম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়,
মানসী প্রেস,
৭৩, মাণিকতলা ষ্ট্রীট,
কলিকাতা

প্রচ্ছদপট পরিকল্পনা—
আশু বন্দ্যোপাধ্যায়

ব্লক ও প্রচ্ছদপট মুদ্রণ—
ভারত ফোটোটাইপ ষ্টুডিও

বাঁধাই—বেঙ্গল বাইণ্ডার্স।

উৎসর্গ

বিশ্রুত-কীর্ত্তি 'পরশুরাম'

শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসু

করকমলেষু—

১০.৬.৪২

ভাগলপুর

উৎসর্গ

বিশ্রুত-কীর্ত্তি 'পরশুরাম'

শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসু

করকমলেষু—

১০.৬.৪২

ভাগলপুর

সূচীপত্র

নরোত্তম

নরোত্তম কিছুদিন হইতে আমার শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতেছে। 'আকর্ষণ' কথাটার মধ্যে যে একটা জবরদস্তির আভাস আছে, তাহা এ ক্ষেত্রে অলীক নহে, সম্পূর্ণ সত্য। নরোত্তমকে আমি শ্রদ্ধা করিতে বাধ্য হইয়াছি। নানারূপ সামাজিক সদ্‌গুণে নরোত্তম মণ্ডিত। সে বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র, দেশের কাজে জেল খাটিয়াছে, পরোপকারী এবং সমাজ সংস্কারার্থে ওজস্বিনী ভাষায় প্রায়ই প্রবন্ধাদি লিখিয়া থাকে। কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও এ যাবৎ সে আমার শ্রদ্ধা উদ্রিক্ত করিতে পারে নাই। তাহাকে সাধারণ আর পাঁচজনের মতই মনে করিতাম। কিন্তু সেদিন জানিলাম সে লুকাইয়া মদ্যপান করে। জানিবামাত্র বুঝিলাম নরোত্তম সাধারণ লোক নহে—সে সত্যই শ্রদ্ধার পাত্র। সে সত্যই মানুষ।

মদ্যপান-প্রসঙ্গ লইয়া নিরপেক্ষভাবে আলোচনা করিতে গেলে আত্মার কথা আসিয়া পড়ে এবং আত্মার কথা আসিয়া পড়িলে সম্ভ্রম না করিয়া পারা যায় না। এই সম্ভ্রম অহেতুক নহে। আত্মা বস্তুটি কি তাহা আমার ঠিক জানা নাই। দেহের কোন্ অংশে তাহার অবস্থিতি সে সম্বন্ধে আমি সম্পূর্ণ অজ্ঞ। আত্মা কোন্ অবস্থায় সৎ, কোন্ অবস্থায় চিৎ এবং কোন্ অবস্থায় আনন্দস্বরূপ তাহা বহু চিন্তাসত্ত্বেও আমার নিকট অনাবিষ্কৃত রহিয়া গিয়াছে। সুতরাং আত্মার প্রসঙ্গ আসিয়া পড়িলেই শ্রদ্ধান্বিত হইতে হয় এবং ব্যাকরণ-সম্মত শুদ্ধ সংস্কৃত বাক্যাবলী ব্যবহার করিতে লোভ জন্মে।

আত্মার তৃপ্তির জন্যই অবশ্য নরোত্তম মদ্যপান করে। আত্মাকে তৃপ্তিদান করা সকলেরই অপরিহার্য্য কর্ত্তব্য এবং সকলেই সে কর্ত্তব্য করিবার জন্য নানা মার্গ অবলম্বন করেন। জ্ঞান-মার্গ, ভক্তি-মার্গ এবং কর্ম্ম-মার্গ—প্রধানত এই ত্রিবিধ মার্গ অবলম্বন করিয়া মানবগণ আত্মাবিনোদন করিয়া থাকেন। ছুৎ-মার্গ কথাটা শুনিয়াছি—কিন্তু মদ-মার্গ বলিয়া কোন বিশেষ মার্গের উল্লেখ আছে বলিয়া জানি না। আমার মনে হইতেছে মদ্যবস্তুটি সমস্ত মার্গের সহিত ওতপ্রোতভাবে জড়িত বলিয়াই হয়তো বিজ্ঞ শাস্ত্রকারগণ ইহাকে একটি পৃথক মার্গরূপে চিহ্নিত করিয়া দিতে ইতস্তত করিয়াছেন। তাঁহারা হয়তো নিগূঢ়ভাবে এই ইঙ্গিতই করিয়াছেন যে, যে কোন মার্গেই আমরা বিচরণ করি না কেন, আত্মাকে প্রকৃত তৃপ্তিদান করিতে হইলে মদ চাই। বস্তুত জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম্ম—অজ্ঞান, অভক্তি, অকর্ম্ম, যে কোন অবস্থার সহিত ইহা বেশ মানাইয়া যায়।

কিন্তু এই মর্ম্মামোদী আলোচনা করিতে করিতে একটি কথা বিস্মৃত হইলে চলিবে না। আমাদের সমাজে মদ জিনিসটা এখনও চায়ের মত চলে নাই। এমন কি মদ্যপান করিলে লোকে এখনও নিন্দাই করিয়া থাকে। কেহ কীর্ত্তনে মাতিয়া রাস্তায় ঢলাঢলি করিলে আমরা বাহবা দিই, কিন্তু মদ খাইয়া রাস্তায় ঢলাঢলি করিলে আমরা তাহাকে পুলিসে দিয়া থাকি। ইহাই বর্ত্তমান সামাজিক নিয়ম। সমাজ সৃষ্টি করিয়াছে মানুষ এবং মানুষ সৃষ্টি করিয়াছেন ভগবান। মানবের কার্য্যকলাপ ও বুদ্ধিবৃত্তির সমালোচনা করার অর্থ ভগবানের বুদ্ধিবৃত্তির সমালোচনা করা। তাহা করিতে আমি অপারগ। বিশেষ ইচ্ছুকও নহি কারণ আমি সমাজের পক্ষপাতী। আমি ইহা সার বুঝিয়াছি যে, এই জ্বালাযন্ত্রণাময় পৃথিবীতে যখন কিছুদিন

বাঁচিতেই হইবে তখন অন্তত পরনিন্দা ও পরচর্চ্চা করিবার জন্যই একটা সমাজ থাকা প্রয়োজন। আমি পরনিন্দাশীল পরচর্চ্চামুখর সমাজের একজন রক্ষণশীল অধিবাসী। এমন কি পরনিন্দা ও পরচর্চ্চার সুযোগ আছে বলিয়াই আমি সমাজের অস্তিত্ব সার্থক মনে করি। সত্য বটে অনেক ভাল পুস্তক, ভাল ছবি, ভাল লোক, ভাল গান এবং অন্যান্য অনেক ভাল জিনিস আমাদের সমাজে তাদৃশ জনপ্রিয় হয় নাই; কিন্তু তাহার জন্য সমাজকে দায়ী করিলে সুবুদ্ধির পরিচয় দেওয়া হইবে না। মদের মত এমন একটা উৎকৃষ্ট জিনিস সমাজে খোলাখুলিভাবে চলিতেছে না, তাহা দুঃখের বিষয় সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহার জন্য দায়ী সমাজ নয়।

তাহার জন্য দায়ী সেই অজ্ঞাত হেতু, যাহা আমাদিগকে দিবসে জ্যোৎস্না এবং রাত্রে রৌদ্র উপভোগ করিতে দেয় না, যাহার জন্য আমরা তবলা বাজাইতে বাজাইতে নিদ্রাসুখ ভোগ করিতে, অথবা মুদ্গর ভাঁজিতে ভাঁজিতে প্রিয়াকে আলিঙ্গন-পাশে বদ্ধ করিতে পারি না। এবম্প্রকার পরস্পরবিরোধী সুখ একসঙ্গে উপভোগ করিতে উৎসুক হইলে একের বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। সমাজ ও মদ একসঙ্গে চলা কঠিন। কিন্তু প্রতিভাশালী ব্যক্তিমাত্রেই কঠিন কার্য্যকে সহজ করিয়া ফেলেন। মোটা লোকের যদি সার্কাসমুখী প্রতিভা থাকে সে অনায়াসে শূন্যে অবস্থিত সরু তারের উপর দিয়া হাঁটিয়া চলিয়া যায়। রাধার অন্তরে প্রেম ছিল কিন্তু মস্তিষ্কে প্রতিভা ছিল না। তাই সে শ্যাম এবং কূল দুই রাখিতে পারিল না। নরোত্তমের মত প্রতিভা থাকিলে সে শ্যাম এবং কূল দুইই বজায় রাখিতে পারিত।

নরোত্তমের সমাজে ভাল ছেলে বলিয়া সুনাম আছে—অথচ

সে লুকাইয়া মদও খায় একথা যতই ভাবিতেছি ততই শ্রদ্ধায় আমার সর্ব্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিতেছে।

মেঘান্তরালবর্ত্তী শশধরের ন্যায়, পত্রান্তরালবর্ত্তী কুসুমের ন্যায়, অবগুণ্ঠনাচ্ছাদিত রূপসীর ন্যায় নরোত্তম দাসের প্রতিভা আমাকে মুগ্ধ করিয়াছে। সন্দেহ করিতেছি গতকল্য সে আমার বোতল হইতে খানিকটা মদ লুকাইয়া পান করিয়া গিয়াছে। কিন্তু কিছুতেই তাহার উপর চটিতে পারিতেছি না। বরং আমার মনে এই দার্শমিক তত্ত্ব উদিত হইতেছে যে, যেমন 'ওঁ' নামক ক্ষুদ্রাকায় বস্তুটি একটা বিরাট-কিছুর প্রতীক, আমাদের নরোত্তমও তেমনই আমাদের স্বদেশীয় প্রতিভার প্রতীক। চিন্তা করিয়া দেখিলে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, আমাদের দেশের প্রতিভার বৈশিষ্ট্য সমন্বয়সাধন। আমরা শৈব ও শাক্ত, তান্ত্রিক ও ব্রহ্মচারী, আমিষ ও নিরামিষ সমস্ত জিনিসের মধ্যে আপোষ করিয়া ফেলিয়াছি। রাধা নিজে যদিও দুই দিক রক্ষা করিতে পারে নাই, কিন্তু রাধাকে দিয়া সব দিক রক্ষা করাইয়া ছাড়িয়াছি। আমরা সূর্য্যগ্রহণের সহিত ব্যাক্‌টিরিয়া-তত্ত্ব মিলাইয়া বৈজ্ঞানিকভাবে হাঁড়ি ফেলিতেছি, গোবর জিনিসটা জীবাণুনাশক বলিয়া আমরা চতুর্দ্দিকে গো-বিষ্ঠা লেপন করিয়া হিন্দুমতে জীবাণুর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিতেছি। বৃহৎ-কাষ্ঠে বসিয়া জাতিভেদ তুলিয়া দিবার মত মানসিক প্রশস্ততা আমাদের আছে এবং লোভনীয় স্ত্রী-রত্ন পাইলে দুষ্কুল হইতেও তাহা গ্রহণ করিবার শাস্ত্রীয় অনুমতি আমরা বহুকাল পূর্ব্বেই পাইয়াছি। সেই সনাতন যুগ হইতেই আমাদের জাতীয় প্রতিভা জীবনের সর্ব্ববিভাগে নানা পরস্পরবিরোধীভাবের সামঞ্জস্য ও সমন্বয়সাধন করিয়া আসিতেছে। রাজনীতির সহিত ত্যাগ ও বৈরাগ্যের আদর্শ

আমাদের দেশের মহাত্মার কণ্ঠেই ধ্বনিত হইয়াছে, সন্ন্যাসীর জীবনে ভোগবিলাসের অপূর্ব্ব সমন্বয় আমাদের দেশেই বহু সন্ন্যাসী-সম্প্রদায়ে অহরহ সাধিত হইতেছে।

শীর্ণ কলেবর বাঙালীর জীর্ণ অঙ্গে এখন হ্যাট কোট প্যাণ্ট নেক্‌টাই দেখি, তাহার ভয়কম্পিত কণ্ঠে যখন হিট্‌লার, মুসোলিনি, লেনিন, ট্রটস্কির তূর্য্যনিনাদ শুনি, ভূতভয়গ্রস্তা, বিলাস-লালায়িতা স্বামী-সন্ধানকারিণী রমণীগণের রসনায় যখন স্ত্রীস্বাধীনতার উগ্র-বাণীমূর্ত্তি রূপায়িত হইয়া উঠে তখন মনে হয় কোন অসূক্ষ্মদর্শী কবি বলিয়াছিল—The East is East and West is West, The twain shall never meet ! এই তো meet করিয়াছে !

আমাদের স্বকীয় প্রতিভাবলে আমরা East, West, North, South, Zenith, Nadir সব একসঙ্গে মিলাইয়াছি। 'বাঙালীর ছেলে ব্যাঘ্রে বৃষভে ঘটাবে সমন্বয় !

নরোত্তমের জয় হউক। ভাল ছেলে বলিয়া সে সমাজে সুনাম অর্জ্জন করিয়াছে—মদও খাইতেছে, কিন্তু লুকাইয়া। তাহার দীর্ঘজীবন কামনা করি।
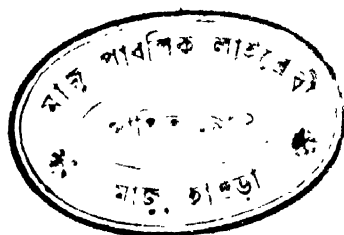
আমাদের শক্তি-সম্পদ

এই পৃথিবীতে বাঁচিয়া থাকিবার জন্য যে যুদ্ধ অহরহ চলিতেছে তাহার নাম জীবন যুদ্ধ। কোন 'লীগ অব নেশন্‌স'এর মধ্যস্থতায় তাহা কোন দিন থামিবে না। তাহার বিরতি নাই—সন্ধি নাই, তাহা অহরহ চলিতেছে এবং চলিবে। আমাদের মত নিরীহ জাতিও এই ভীষণ যুদ্ধে লিপ্ত আছে এবং আশ্চর্য্যের কথা এই যে, এখনও লুপ্ত হয় নাই। প্রত্যক্ষ প্রমাণ, আমরা এখনও বাঁচিয়া আছি। ভাবিয়া দেখিলে শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে। মশা, মাছি, প্রতিবেশী হইতে আরম্ভ করিয়া সমগ্র বিশ্ব-জগৎটাই আমাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতেছে। জীবন-যুদ্ধে সকলেই আমাদের শত্রুপক্ষীয়। এই বিরাট বিশ্বব্যাপী শত্রুবাহিনীর বিপক্ষে আমরা—নিধিরাম সরদারগণ—কি করিয়া টিকিয়া আছি, ইহা পরম বিস্ময়ের বস্তু। ইহা তো বিস্ময়ের বস্তু বটেই, অধিকতর বিস্ময়ের বস্তু এই যে, আমরা আমাদের শক্তি-সম্পদ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন। আমরা নিজেরাই জানি না কিসের জোরে আমরা এই জীবন-যুদ্ধে যুঝিতেছি। ক্ষতবিক্ষত হইয়াছি সত্য, কিন্তু এখনও পর্য্যন্ত পরাজিত হই নাই। এ যুদ্ধে পরাজয় মানে মৃত্যু। আমরা এখনও মরি নাই—এখনও বাঁচিয়া আছি।

কিন্তু, কিসের জোরে ?

'আমাদের তো টিকিয়া থাকিবার কথা নহে' এ কথা যিনি বলিবেন তিনি জীবন-যুদ্ধের ইতিহাস ও বিজ্ঞান সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ।

'টিকিয়া থাকিবার কথা নহে' অপেক্ষা 'টিকিয়া আছি' প্রবলতর যুক্তি।

কেন টিকিয়া আছি, কি করিয়া টিকিয়া আছি, আমাদের শক্তি-সম্পদ কোথায়, তাহা চিন্তা করিতে গিয়া বারম্বার আমার এই কথাই মনে হইয়াছে যে, সত্যই আমরা আত্মবিস্মৃত জাতি নিজেদের সম্পদ সম্বন্ধে আমাদের চেতনা মোটেই জাগরূক নহে। আমরা সোনা ফেলিয়া সর্ব্বদাই আঁচলে গেরো বাঁধিতেছি।

আমাদের ঐতিহাসিকগণ, সাহিত্যিকগণ, কবিগণ যে সমস্ত সম্পদের কথা লইয়া বিস্তৃত বাগ্‌বিস্তারকরত আমাদের ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছেন জীবন-যুদ্ধে সে সব সম্পদ অতি অকিঞ্চিৎকর।

ঐতিহাসিকগণ আমাদের অতীতের ঐশ্বর্য্য সম্বন্ধে সচেতন করিতেছেন। নানারূপ গবেষণা করিয়া তাঁহারা প্রমাণ করিতে উৎসুক যে অতীত কালে আমরা—অর্থাৎ আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা সকলেই কেষ্ট-বিষ্টু ছিলেন। ছিলেন তো ছিলেন! আনন্দের কথা। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, তাহাদের কেষ্ট-বিষ্টুত্বের জোরেই কি আমরা বর্ত্তমানে গ্রাসাচ্ছাদন জুটাইতেছি?

আমাদের স্বাস্থ্য-সম্পদ লইয়া অনেকেরই মস্তক আজকাল ঘর্ম্মাক্ত। স্বাস্থ্যবান হওয়া ভাল কথা; কিন্তু স্বাস্থ্য জীবন-যুদ্ধের প্রধান সহায় হইলেও মূল-শক্তি নয়। আহার না জুটিলে স্বাস্থ্য থাকে না। সুস্থ ব্যক্তিমাত্রেই যে আহার জুটাইতে পারিবেন এমন কোন কথা নাই। ইহার প্রমাণ আমরা প্রত্যহ পাইতেছি। আমাদের প্রাকৃতিক সম্পদ, আধ্যাত্মিক সম্পদ, খনিজ সম্পাদ, অরণ্য-সম্পদ, শাস্ত্র-সম্পদ, সাহিত্য-সম্পদ প্রভৃতি নানাবিধ বাজে সম্পদ লইয়া আমরা উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠি, কিন্তু আমাদের জীবন-যুদ্ধে

যাহারা আসল সম্পদ তাহাদের উল্লেখ পর্য্যন্ত করি না। আত্মবিস্মৃত জাতিই বটে।

আমরা যে আজও বাঁচিয়া আছি তাহার কারণ রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা বা মহাত্মাজীর দার্শনিক রাজনীতি নয়—তাহার কারণ দোকানী আমাদের ধারে খাইতে পরিতে দেয়, দরজি ধারে আমাদের হালফ্যাশানদুরস্ত পরিচ্ছদ প্রস্তুত করিয়া দেয়, নাপিত ধারে আমাদের চুল-গোঁফ-জুলফির তদারক করে, ধোপা ধারে আমাদের পরিচ্ছন্ন রাখে এবং বাড়ীওয়ালা বাকি পড়িলে গলাধাক্কা দিয়া রাস্তায় বাহির করিয়া দেয় না।

ইহারা আমাদের জীবন-যুদ্ধের শক্তি ও সম্পদ। অথচ ইহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া কয়জন কবি কবিতা লিখিয়াছেন—ইহাদের উপলক্ষ করিয়া কয়টা উৎসবই বা অনুষ্ঠিত হইয়াছে? একটাও নয়!

কিন্তু আমি বলিতেছি, এইবার অবহিত হইবার সময় আসিয়াছে। বাঙালীর ভাগ্যাকাশে দারুণ দুর্য্যোগ ঘনাইয়া আসিতেছে। আমাদের জীবন-যুদ্ধের প্রধান শক্তিগুলির সম্বন্ধে আর উদাসীন থাকিলে চলিবে না।

অর্থাৎ উহাদিগকে তোয়াজ করিতে হইবে।

সাহিত্যিকগণের তরফ হইতে আমি এইটুকু শুধু বলিতে চাই যে, হে কবিগণ, তোমরা এইবার ফুল, জ্যোৎস্না, প্রিয়া ছাড়িয়া মুদি-কৌমুদী রচনা কর, এইবার দোকানীর দো-কান তোমাদের কাব্যলক্ষ্মীর লীলাক্ষেত্র হউক। যে দরজির প্রসাদে তুমি সভ্যভব্য বেশে ভদ্রলোক বলিয়া সমাজে পরিচয় দিতে পারিতেছ তাহার সেলাই-কলের খচখচ-ধ্বনিতে তোমার কবিতা খচিত হউক। সভা করিয়া রজক ও নাপিতের গলায় মালা দিয়া তাহাদিগকে সম্বর্দ্ধনা

কর। বাড়ি-ওয়ালাগণকে আর গালাগালি দিও না—তাহাদের বক্র হাসিতে বিচলিত হইও না, উদ্বোধিত হও। যেরূপ দুর্য্যোগ ঘনাইয়া আসিল তাহাতে রাস্তায় দাঁড়ান মোটেই সুখজনক হইবে না।

এইবার সাহিত্যে, চিত্রে, স্থাপত্যে বাস্তবিক বস্তুতন্ত্রতা মূর্ত্ত হউক। দোকানী, দরজি, ধোপা ও নাপিতকে বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টিতে দেখিয়া তাহাদের স্বরূপ শ্রদ্ধান্বিত অন্তরে আঁকিবার চেষ্টা কর।

কামান, জাহাজ ও সেনাদল লইয়া যদি পাশ্চাত্য সাহিত্যিকগণ সারবান সাহিত্য রচনা করিতে পারিয়া থাকেন—এই সব মহানুভব দোকানী, দরজি, ধোপা, নাপিতকে লইয়া আমরাই বা পারিব না কেন? জীবন-যুদ্ধে ইহারাই তো আমাদের কামান, জাহাজ ও সেনাদল।

আধুনিক গল্প-সাহিত্য*

বর্ত্তমান যুগ সম্মিলনের যুগ। সাহিত্যিকগণকেও মাঝে মাঝে সম্মিলিত হইয়া সপ্রমাণ করিতে হয় যে তাঁহারাও এ যুগের অযোগ্য নহেন। ভাবিতেছি দেশের সমস্ত পাখী কিম্বা নদীনদ যদি যুগধর্ম্মে অণুপ্রাণিত হইয়া সম্মিলিত উৎসাহে নিজেদের বৈশিষ্ট্য প্রচার করিতে উদ্বোধিত হইত তাহা হইলে কি বিরাট ব্যাপারই না হইত! কিন্তু হায়, তাহা হইবার নহে—কারণ উহারা মনুষ্য নহে। মানুষই আত্মপ্রচারার্থে দল বাঁধিতে ভালবাসে। যখন ছাপাখানা হয় নাই তখন সাহিত্যিককে আত্মপ্রচার করিবার জন্য দল গঠন করিতে হইত। সাহিত্য জিনিষটা যদিও নির্জ্জনেই বিকশিত হয়, কিন্তু বিকশিত হইবামাত্রই জনতার দিকে তাহার স্বাভাবিক গতি। স্রষ্টা আপন সৃষ্টিকে লুকাইয়া রাখিতে পারে না। লুকাইয়া রাখিতে চাহে না। সেইজন্য যখন ছাপাখানার সুবিধা ছিল না তখন কবিকে দল গঠন করিতে হইত, নাট্যকারকে যাত্রার জনতার উপর নির্ভর করিতে হইত, সুবক্তা সুগায়ক সকলেই সেখানে সাহিত্যিক সহযোগে সানন্দে সম্মিলিত হইতেন।

এখন কিন্তু মুদ্রাযন্ত্রের যুগ। এখন কবি বা সাহিত্যিককে যাত্রার দল বাঁধিয়া সাহিত্য-প্রচার করিতে হয় না। মুদ্রাযন্ত্র সে ভার লইয়াছে। বর্ত্তমানে সাহিত্য জনসাধারণের মধ্যে বিতরিত হইতেছে—মাসিক, সাপ্তাহিক ও অন্যান্য নানাবিধ সাময়িক পত্রিকার মারফৎ

* চন্দননগর সাহিত্য সম্মিলনের বিংশ অধিবেশনে পঠিত।

এবং এই সব সাময়িক পত্রিকাগুলির ক্ষুধা এত প্রচণ্ড যে ইহাদের উদরপূর্ত্তি করিতেই সাহিত্যিকগণকে অনেক সময় দেউলিয়া হইয়া যাইতে হয়; সম্মিলনে পাঠ করিবার উপযোগী ভাল সাহিত্যিক রচনা সঞ্চয় করিয়া রাখা অনেক ক্ষেত্রেই তাঁহাদের সম্ভবপর হইয়া উঠে না।

সুতরাং আমাদের সাহিত্যিক সম্মিলনে 'সম্মিলন' জিনিসটাই মুখ্য বস্তু। এই সম্মিলনে ভাল প্রবন্ধ পাঠ করিতে অনুরোধ করিয়া অভ্যর্থনা সমিতি যেমন আমাদের সম্মানিত করিয়াছেন—তেমনই অসুবিধাতেও ফেলিয়াছেন। প্রথমেই সমস্যা—কি লিখি! নিজের বিদ্যা, বুদ্ধি ও সামর্থ্যের ওজন করিয়া হতাশ হইয়া পড়িতে হয়।

সাধারণত যেসব প্রবন্ধ সুচিন্তিত ও সারগর্ভ বলিয়া প্রখ্যাত তাহা লেখা অন্তত আমার সাধ্যাতীত। "গীতার ভাষ্য" বা "মোগল হারেমে বৈষ্ণব প্রভাব" অথবা "বালীদ্বীপের উদ্ভিদ্" জাতীয় প্রবন্ধ লেখার মত বিদ্যা আমার নাই।

সামাজিক কোন সমস্যা লইয়া আলোচনা করিতে যাওয়া আরও বিপজ্জনক। কারণ সামাজিক সমস্যার সহিত রাজনৈতিক সমস্যা অঙ্গাঙ্গীভাবে বিজড়িত এবং ইহাও আমরা সকলে জানি যে এদেশে রাজনীতি প্রজানীতি নহে। সুতরাং সাহিত্য-সভায় ওসব সমস্যা না উত্থাপন করাই ভাল।

রবীন্দ্রনাথকে লইয়া কিছু আলোচনা করিলে হয়। কারণ বর্ত্তমান যুগে রবীন্দ্রনাথকে লইয়া আলোচনা করাটা একটা প্রথার মধ্যে দাঁড়াইয়া গিয়াছে। অজস্র স্তুতিবাদ করিতে করিতে রবীন্দ্র-সাহিত্য হইতে কিছু কিছু কবিতা উদ্ধৃত করিয়া রবীন্দ্রনাথকে প্রশংসার সপ্তম স্বর্গে তুলিয়া দেওয়াও যত সহজ, আবার বিজ্ঞের মত

ঘাড় নাড়িতে নাড়িতে বিদেশী সাহিত্য-সমালোচকগণের নিকট *ধার-করা বুলি আওড়াইয়া রবীন্দ্রনাথকে নিন্দার নিম্নতম নরকে* নামাইয়া দেওয়াও তত সহজ। উপরোক্ত কোন প্রকার কার্য্যের জন্যই রবীন্দ্র-সাহিত্যের সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের প্রয়োজন নাই। "রবীন্দ্র-কাব্যে অতীন্দ্রিয়বাদ" কিম্বা "রবীন্দ্রনাথের গদ্য-কবিতা" লইয়া সহজেই একটা উচ্ছ্বাস রচনা করা যায়। করিলাম না—কারণ আধুনিক বাঙলা সাহিত্যের কথা আমার মনে পড়িয়া গেল। ছাই ফেলিতে ভাঙা কুলা—'আধুনিক বাঙলা সাহিত্য' যখন রহিয়াছে তখন আর ভাবনা কি! এ সম্বন্ধে যে কোন সময়ে ও যে কোন স্থানে দুই চারি কথা বলা প্রাসঙ্গিক।

সুতরাং লিখিতে সুরু করিলাম—

"বাঙালীর ক্ষুদ্রপরিসর জীবনের প্রতিচ্ছবিই মুখ্য ও গৌণভাবে আধুনিক বাঙলা সাহিত্যে রূপায়িত হইয়া উঠিতেছে। এই-সজ্জার অধিকাংশ উপকরণ আবার বিদেশ হইতে আমদানি করিতে হইতেছে। শুধু আধুনিক কেন, সমগ্র বাঙলা সাহিত্যটাই একটা সঙ্কীর্ণ সাহিত্য। বাঙলা সাহিত্যে নাম করিবার মত কয়টা বৃহৎ উপন্যাস সৃষ্টি হইয়াছে? বৃহৎ উপন্যাস বলিতে বুঝি বৃহৎ শহরের মত সৃষ্টি। তাহাতে যেমন প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড রাজপথ আছে, আকাশ-চুম্বী কারুকার্য্যখচিত প্রাসাদ আছে, প্রাচীন শিল্পকলার নিদর্শন মন্দির মিনার আছে, সুসজ্জিত বাগান, সুনির্ম্মল পুষ্করিণী, সুরক্ষিত প্রান্তর, সুবিন্যস্ত পণ্যবিপণি আছে, গলিঘুঁজিও আছে—নর্দ্দমা নালাও আছে—ধনী আছে—ভিখারীও আছে। পুণ্যাত্মাও আছে—পাপীরও অভাব নাই। সত্য, শিব এবং সুন্দরের সহিত অসত্য, অশিব এবং অসুন্দরের নিত্য দ্বন্দ্বে তাহা স্পন্দমান। এরূপ উপন্যাস

একটাও নাই। নাই, তাহার কারণ আমাদের জীবনে বৃহৎ শিক্ষা ও বৃহৎ দুঃখ একসঙ্গে এখনও আসে নাই। সুশিক্ষিত মন দুঃখের আবেষ্টনীতে পড়িলে তবে বৃহতের দর্শন পায়। আমরা এখনও সুশিক্ষিতও হই নাই এবং চরম দুঃখও এখনও আমাদের জীবনে আসে নাই।

ডষ্টয়েভ্স্কি, চার্লস ডিকেন্স অথবা ম্যাক্সিম গোর্কির আবির্ভাবের জন্য আমাদের এখনও নিদারুণ তপস্যার প্রয়োজন আছে। সৌখীন দারিদ্র্যের অভিনয় করিয়া বৃহৎ কাব্য সৃষ্টি করা যায় না। আমরা উপন্যাস বলিয়া সাধারণত যাহা পড়ি ও লিখি তাহা বড় ছোট-গল্পমাত্র। উপন্যাসের বৈচিত্র্য ও বৃহত্ব তাহাতে নাই।

সত্যকার ছোটগল্পও আমরা সৃষ্টি করিতে পারিতেছি না। ছোটগল্প-রসিক পাঠক পাঠিকা আমাদের দেশে কম। এক গাদা পান্তা ভাত খাইয়া যাহার তৃপ্তি হয়, সে একটি আঙুর কিম্বা একটি আপেল খাইয়া সন্তুষ্ট থাকিতে পারে না। সুতরাং এক গাদা পান্তা ভাতের সহিত মিশাইয়া আঙুর বা আপেলের টুকরা চালাইতে হইতেছে। তাহা ছাড়া গল্প-সাহিত্যের আর একটা দুর্দ্দশার কারণ এদেশে গল্প-সাহিত্যের পাঠক অপেক্ষা পাঠিকার সংখ্যাই বেশি। আমাদের দেশে স্ত্রীশিক্ষা এখনও খুব উচ্চস্তরে উঠে নাই। সুতরাং বর্ত্তমান যুগের স্বল্প-শিক্ষিতা পাঠিকাগণের শিক্ষা, দীক্ষা, রুচি ও রসবোধের উপর নির্ভর করিতে গিয়া আধুনিক বাঙলা গল্প-সাহিত্য অন্তঃসারশূন্য, অশিক্ষিত মন-রোচক ও লঘু হইয়া উঠিতেছে। ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ আমরা পাই মাসিকপত্রের কাটতি দেখিয়া। যে মাসিকপত্র সর্ব্বাপেক্ষা বেশি বিক্রয় হয়, সাহিত্যিক আদর্শ তাহাতে কতটা অনুসৃত হয়?

আরও দুঃখের বিষয় এই যে আমাদের সাহিত্যে প্রকৃত সমালোচনা বলিয়া কিছু নাই। একটাও এমন নিরপেক্ষ ভাল সাহিত্যিক পত্রিকা এদেশে নাই যাহার সমালোচনার প্রকৃত সাহিত্যিক মূল্য আছে। সমালোচনা করিতে বসিলেই বাঙালীর পরনিন্দাপ্রবণতা বা চক্ষুলজ্জা আসিয়া সমালোচনা সাহিত্যকে একদেশদর্শী করিয়া তোলে।

কিন্তু বিশ্ব-সাহিত্যের তুলনায়—"

এই পর্য্যন্ত লিখিয়াছিলাম এমন সময় দেখিলাম, এক জোড়া নির্ম্মম চক্ষু নিষ্পলকভাবে আমার দিকে স্থিরদৃষ্টিতে চাহিয়া আছে। সে চাহনিতে ব্যঙ্গ ও ভর্ৎসনা যেন মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে। চক্ষু দুইটির মালিক অপর কেহ নহে আমারই বিবেক। বিবেকের কণ্ঠস্বরও ক্রমশঃ শোনা গেল। শুনিলাম বিবেক বলিতেছে—

"তুমি বিশ্ব-সাহিত্যের কতটুকু খবর রাখ হে বাপু? তোমার বিদ্যা তো আমার অবিদিত নাই। আধুনিক সাহিত্য সম্বন্ধেই বা তোমার জ্ঞান কতটুকু এবং তাহা লইয়া সমালোচনা করিবার অধিকারই বা তোমাকে কে দিল? আধুনিক সাহিত্যের মূল্য নিরূপণ করা কি কোন আধুনিক লেখকের পক্ষেই শোভন, না সম্ভব? এইসব সমালোচনা করিবার অছিলায় তুমি তো শুধু নিজের ঢাকটাই পিটাইতেছ! ভাল করিয়া ভাবিয়া বল দেখি বাপু ইহার মূলে তোমার পরশ্রীকাতরতা ও সস্তায় নাম কিনিবার লোভ আছে কি না?"

দমিয়া গেলাম।

লেখনী সম্বরণ করিতে হইল।

আধুনিক গল্পসাহিত্য লইয়া আসর জমাইব ভাবিয়াছিলাম কিন্তু ওই নির্ম্মম চক্ষুর নিষ্পলক চাহনিকে অগ্রাহ্য করা অসম্ভব।

কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া বসিয়াছিলাম, এমন সময়ে একজন অতি আধুনিক গল্পরচয়িতা আসিয়া আমাকে সঙ্কট হইতে উদ্ধার করিলেন। তিনি আসিয়া অতীব আগ্রহে তাঁহার স্বরচিত একটি গল্প আমাকে শুনাইলেন। আজিকার এই সাহিত্যিক মজলিশে আমি আপনাদের সেই গল্পটি শুনাইব। গল্পটি আধুনিকতম। কোথাও এখনও ইহা প্রকাশিত হয় নাই—লিপিবদ্ধ করিবার ক্ষমতাই রচয়িতার নাই। মুখে মুখে বলিয়া গেল।

"এক ছিল রাজা আর তার ছিল এক রাণী।

সেদিন ভোরবেলা উঠেই রাজা ছুটে বাগানে চলে গেল। বাগানে গিয়ে দেখলে, গাছে বেশ সুন্দর লাল লাল জবাফুল ফুটেছে। সে বাগান থেকে একটা টকটকে লাল জবাফুল তুলে নিয়ে এল। ফুলটা নিয়ে এসে রাণীকে বললে—'দেখেছ কেমন সুন্দর ফুল এনেছি একটা—'

রাণী বললে—'বেশ সুন্দর—আমাকে দাও।'

রাজা ফুলটা দিতেই রাণী দৌড়ে গিয়ে ভেতর থেকে একটা ফুলদানি নিয়ে এল। তারপর ফুলদানিতে ফুলটা রেখে রাজা-রাণী দুজনে উবু হয়ে বসে ফুলটাকে দেখতে লাগল। তারপর রাজা বললে—'চল ফুলটাকে টেবিলে রাখি।' রাণী বললে—'না—এইখানেই থাক—'

দুজনে খুব তর্ক হতে লাগল। ঝগড়া করতে করতে বেলা অনেক বেড়ে গেল।

ঠাকুর এসে বললে—'রান্না হয়ে গেছে।'

দুজনে তখন উঠে স্নানটান করে খাওয়াদাওয়া সেরে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

ফুলটা মেঝেতেই পড়ে রইল।

ঘুম ভেঙে উঠে রাজা গেল বেড়াতে। মাঠে গিয়ে দেখে একটা শেয়াল। রাজা তাকে ধরবার জন্য ছুটল। রাজাও ছুটছে—শেয়ালও ছুটছে। রাজার সঙ্গে শেয়াল পারবে কেন? রাজা এক ছুটে গিয়ে দৌড়ে শেয়ালটাকে টপ করে ধরে ফেললে, তারপর কান ধরে টানতে টানতে সেটাকে বাড়িতে নিয়ে এল। নিয়ে এসে মস্ত একটা খাঁচার ভেতর পুরে তাকে রেখে দিলে।

রাণী এসে বললে—'আহা বেচারি যদি মরে যায়!'

রাজা বললে—'একটু দুধ দাও না ওকে।'

রাণী শেয়ালটাকে একটা মাটির ভাঁড়ে করে দুধ এনে দিলে। শেয়ালটা চুক্‌চুক্ করে খেতে লাগল। তারপর রাজা-রাণীও খাওয়া-দাওয়া সেরে খিল বন্ধ করে শুয়ে পড়ল। রাত হয়ে গেল।

তার পরদিন সকালে রাজা-রাণী উঠল।

রাণী চা করে দিলে, রাজা খেলে।

তারপর রাজা পাড়ায় বেরুলো। বেরিয়ে ঘুরে ঘুরে অনেক ক্যালেণ্ডারের ছবি রাজা জোগাড় করলে। সুন্দর সুন্দর বড় বড় সব ছবি। ছবিগুলো এনে টেবিলে রেখে রাজা ছুটে বাগানে চলে গেল। গিয়ে অনেক জবাফুল তুলে আনলে। তারপর রাজা-রাণী দুজনে মিলে ছবি আর জবাফুল নিয়ে ঘরের সমস্ত দেওয়াল সাজাতে লেগে গেল। সাজাতে সাজাতে সন্ধ্যে হয়ে এল। সমস্ত দিন খাওয়াই হল না।

সন্ধ্যেবেলা দুজনে খাওয়াদাওয়া সেরে শুয়ে পড়ল। তখন অন্ধকার হয়ে গেছে—আকাশে অনেক নক্ষত্র উঠেছে।

তার পরদিন সকালবেলা উঠেই রাজা বাড়ির পেছন দিকে যে

পেয়ারা গাছটা ছিল তাতে গিয়ে উঠল। একটু পরে রাণীও এসে উঠল। অনেক পেয়ারা ছিল সে গাছটাতে। দুজনে খাচ্ছে তো খাচ্ছেই, খেয়েই যাচ্ছে। পেয়ারা আর ফুরোয় না। শুধু পেয়ারা নয়, পেয়ারা পাতাও চিবুতে লাগল দুজনে।

রাণীটা এমন দুষ্টু, রাজার হাতে একটা বড় ডাঁশা পেয়ারা দেখে টপ করে সেটা কেড়ে নিলে। রাজা অমনই রাণীর গালে ঠাস করে এক চড়। রাণীও সঙ্গে সঙ্গে রাজার গালে খামচে দিলে। দুজনে আড়ি হয়ে গেল। রাণী সে গাছ থেকে নেবে গিয়ে আর একটা গাছে উঠল।

রাজা একটু পরে রাণীকে ডেকে বললে—'আয় ভাই, ভাব করি!'

রাণী রাজি হ'ল না।

রাজা তখন নিজের গাছ থেকে নেবে রাণীর গাছে গিয়ে উঠে রাণীকে অনেক ভাল ভাল পেয়ারা দিয়ে ভাব করলে। ভাব হবার পর দুজনে পেয়ারা গাছের ডালে বসে পা দুলিয়ে দুলিয়ে অনেক পেয়ারা খেতে খেতে অনেকক্ষণ ধরে গল্প করতে লাগল। একটু পরে দুজনে গাছ থেকে নেমে এল। আসবার সময় রাজা কিছু পেয়ারা পকেটে করে নিয়ে এল—নিয়ে এসে খাঁচায় শেয়ালটাকে দিলে। শেয়ালটাও মজা করে পেয়ারা খেতে লাগল।

বিকালবেলা রাজা বন্দুক হাতে করে বেরুলো। একটু পরে অনেক পাখী শিকার করে নিয়ে এল। বড় বড় সব হাঁস। রাণী নিজে হাতে মাংস রান্না করলে। রাজা বললে, চল ছাতে বসে খাওয়া যাক। ছাতে ওঠবার একটা সিঁড়ি ছিল। রাজা সেটা দিয়ে না উঠে এক লাফে ছাতে গিয়ে উঠল। রাণী বাসনকোসন বয়ে সিঁড়িটা দিয়ে উঠতে লাগল। খাওয়াদাওয়া হয়ে গেলে রাজা আবার এক

লাফে ছাত থেকে নেমে এল। নেমে এসে মাংসের হাড়গুলো শেয়ালটাকে দিলে।

এই পর্য্যন্ত বলিয়া গল্পকার চুপ করিলেন।

আমি বলিলাম, "তারপর ?"

"তারপর রাজা একদিন একটা বাঘ ধরে আনলে, আর একদিন একটা টিয়াপাখী—"

তাঁহার উৎসাহ আবার সঞ্জীবিত হইতেছে দেখিয়া আমি বলিলাম, "আচ্ছা, থাক—আজ আর নয়—কাল শুনব বাকীটা"।

এই গল্প বাস্তব কি অবাস্তব, সুন্দর কি কুৎসিত, ভূ-ভারতে এরূপ কোন রাজকীয় দম্পতী থাকা সম্ভবপর কিনা সে বিচার আপনারা করুন, বিশ্ব-সাহিত্যে এ গল্পের স্থান হইবে কিনা জানি না, আমি শুধু ইহাই নিঃসংশয়রূপে জানি যে ইহার রচয়িতার বয়স মাত্র পাঁচ বৎসর, * সে মধ্যবিত্ত ঘরের সন্তান এবং তাহার হাতে খড়ি পর্য্যন্ত হয় নাই। তাহার কল্পনা অদেখা রাজারাণীকে লইয়া গল্প রচনা করিতেছে এবং তাহার ধারণা গল্পটি নিখুঁত হইয়াছে। বয়সের দিক দিয়া বিচার করিলে গল্পকারকে তরুণতম এবং সময়ের দিক দিয়া বিচার করিলে গল্পটিকে আধুনিকতম বলিতেই হয়। যদি আপনারা কেহ ইহাতে আপত্তি করেন বুঝিব আপনারা সম্যকরূপে প্রগতিশীল নহেন।

* গল্পটির কথক আমার পুত্র শ্রীমান অসীম

পরচর্চ্চা

পরনিন্দা ও পরচর্চ্চা করিয়াই দেশটা উচ্ছন্ন যাইতেছে। পল্লীগ্রামে আছে চণ্ডীমণ্ডপ আর শহরে ক্লাব। চণ্ডীমণ্ডপ ও ক্লাবগুলিতে প্রতিদিন ওই পরনিন্দা ও পরচর্চ্চা ছাড়া আর কিছুই হয় না। যতই ভাবিতেছি ততই ক্ষোভ হইতেছে। আরও গভীর পরিতাপের বিষয় এই যে, এইভাবে যাহারা দেশকে উচ্ছন্নের পথে পরিচালিত করিতেছে আমিও তাহাদিগের মধ্যে অন্যতম। যদিও আমি কোন চণ্ডীমণ্ডপ বা ক্লাবের সভ্য নহি কিন্তু গৃহকোণে বসিয়া বসিয়াই প্রিয়বন্ধু প্রাণকান্তের সহিত প্রতি সন্ধ্যায় যে পরিমাণ পরনিন্দা ও পরচর্চ্চা করিয়া থাকি, তাহাতে একটা কেন দশটা দেশ স্বচ্ছন্দে উচ্ছন্ন যাইতে পারে। দেশ উচ্ছন্ন যাউক তাহাতে আমার কিছু যায় আসে না, কিন্তু আমি তাহার কারণ হইতে চাহি না। আমি ইহা চাহি না যে, লোকে আমার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিবে—পরনিন্দা ও পরচর্চ্চা করিয়া যেসব মহাত্মা দেশকে উচ্ছন্ন দিয়াছেন—'ইনি তাঁহাদের মধ্যে একজন।' ইহা আমি চাহি না। আমার নানা দুর্ব্বলতার মধ্যে ইহাও একটি। আমি কোন ব্যাপারেই অঙ্গুলি-নির্দ্দিষ্ট হইতে রাজি নহি।

জিজ্ঞাসু ব্যক্তির মনে অবশ্য স্বতই এ প্রশ্ন জাগিতে পারে, 'পরনিন্দা পরচর্চ্চা করিলে দেশ উচ্ছন্ন যাইবে কি প্রকারে? কি প্রকারে—তাহার বিস্তৃত আলোচনা করা আমার সাধ্যাতীত, কিন্তু ইহা আমি অন্তরে অন্তরে অনুভব করিয়াছি যে, দেশকে উচ্ছন্নে

পাঠাইবার ইহা একটি প্রশস্ত পথ। জিজ্ঞাসু ব্যক্তি যে কোন চিন্তাশীল পণ্ডিতের নিকট গেলেই তাঁহার প্রশ্নের সদুত্তর পাইবেন। উক্ত জিজ্ঞাসু ব্যক্তি যদি পুনরায় আমাকে প্রশ্ন করেন যে, 'উচ্ছন্ন মানেই বা কি? ইহা বলিতে আমি কি বুঝি?' তাহাও তাঁহাকে আমি বুঝাইতে পারিব না। কারণ 'উচ্ছন্ন যাওয়া' মানে এমন একটা শোচনীয় অবস্থা যাহা বর্ণনা করিতে হইলে রীতিমত আলঙ্কারিক হওয়া প্রয়োজন। আমি আলঙ্কারিক নহি। সুতরাং জিজ্ঞাসু ব্যক্তির নিকট নিজের দীনতা জ্ঞাপন করা ছাড়া আর অন্য কিছুই করিবার আমার উপায় নাই।

মোট কথা, ঠিক করিয়াছি আর পরচর্চ্চা করিব না। সন্ধ্যাবেলা যেই প্রাণকান্ত আসিয়া ঘরের কোণে লাঠিটা রাখিতে রাখিতে সস্মিতমুখে সুরু করিবে—'শুনেছ হে, আমাদের পাড়ায় রাধু ময়রার ভাদ্দর বউ—' আর অমনই আমি সট্‌কাটি বাগাইয়া উৎকর্ণ হইয়া বসিব—সেটি আর হইবে না। রাধু ময়রার ভাদ্রবধূ ব্যতীত আলোচ্য বিষয় পৃথিবীতে অনেক আছে।

......সন্ধ্যার অন্ধকার গাঢ় হইয়াছে। চতুর্দ্দিকে ঝিল্লীর ধ্বনি। একা নিজের নির্জ্জন ঘরটিতে বসিয়া আছি। ঘরের কোণে টেবিলে বাতিটি কমানো রহিয়াছে—ঘরে স্বল্পালোকিত অন্ধকার। সট্‌কায় মৃদু মৃদু টান দিতেছি। ধূপের মৃদুগন্ধে সমস্ত ঘরটি পরিপূর্ণ। বারান্দায় খুট্‌খুট্‌ শব্দ হইল। প্রাণকান্ত আসিতেছে! সন্ধ্যাকালটা প্রাণকান্তের সহিত বিশ্রম্ভালাপ করিয়াই কাটে। আজ প্রতিজ্ঞাদুর্গের মধ্যে অটল হইয়া বসিয়া আছি—আর যাই করি পরচর্চ্চা করিব না। প্রাণকান্ত আসিয়া ঘরের নির্দ্দিষ্ট কোণটিতে লাঠিটি রাখিয়া স্মিতমুখে বলিল—"আজ এত গম্ভীর বদন যে—"

মুখে হাসি টানিয়া আনিয়া বলিলাম—"তোমার বিরহে। চা খাবে না কি? ওরে ভূতো—"

ভূতো নামক ভৃত্য আবির্ভূত হইলে দুই কাপ কড়া চা ফরমাস করিলাম।

প্রাণকান্ত র‍্যাপার দিয়া পা দুইটি ঢাকিতে ঢাকিতে বলিল "—ঠাণ্ডাটা আবার জমকে পড়ল—"

চা আসিল।

এক চুমুক চা পান করিয়াই প্রাণকান্তের প্রাণ খুলিয়া গেল। আবেগ-তরল কণ্ঠে কহিল—"আমাদের পাশের বাড়িতে কোলকাতা থেকে এসা এক আপ-টু-ডেট মেয়ে এসে জুটেছে ভাই—"

এইটুকু বলিয়া ডিশে চা ঢালিয়া সুড়ুৎ করিয়া আরও খানিকটা গলাধঃকরণ করিয়া ফেলিল।

লোকটার উপর আমার ঘৃণা হইতে লাগিল এবং এইরূপ লোকের সঙ্গলাভের জন্য লোলুপ বলিয়া নিজেকেও মনে মনে যৎপরোনাস্তি ধিক্কার দিলাম।

বলিলাম—"ওসব পরচর্চ্চা ছাড়। এই করেই দেশটা উচ্ছন্ন গেল। ছাড় ওসব—"

এই অপ্রত্যাশিত উক্তিতে প্রাণকান্তের শারীরিক ভাবকেন্দ্রই বোধ হয় বিচলিত হইল। খানিকটা চা চল্‌কাইয়া তাহার র‍্যাপারে পড়িয়া গেল। বিস্ফারিত দুইটি চক্ষুর দৃষ্টি সে আমার উপর নিবদ্ধ করিল।

"সন্ধ্যেটা কাটে কি করে তা হলে বল—"

মন আমার ধর্ম্মভাবে পরিপূর্ণ। উত্তর সহজেই দিলাম—"তার জন্যে ভাবনা কি? একটা বই চেঁচিয়ে পড় না, শোনা যাক।

পরচর্চ্চা করবার দরকার কি? এই নাও—” বলিয়া নিকটস্থ শেল্‌ফ হইতে একটি পুরাতন বাঁধানো মাসিকপত্র দিলাম। সেকালের *‘বঙ্গদর্শন’*। *ভাল জিনিস।*

“ওর থেকে যে কোন একটা লেখা পড় না কেন? শিক্ষাও হবে—সময়ও কাটবে—”

প্রাণকান্ত নিঃশব্দে বাকি চাটুকু নিঃশেষ করিল। তাহার পর নিঃশব্দেই গোঁপটি পরিপাটিরূপে মুছিয়া পকেট হইতে সিগারেট বাহির করিল এবং দিয়াশালাই-বাক্সের উপর সেটি লঘুভাবে ঠুকিতে লাগিল।

সিগারেটটি ধরাইয়া একমুখ ধোঁয়া ছাড়িয়া পরিশেষে সে বলিল—“এ তো অতি উত্তম কথা। আলোটা একটু উস্‌কে দাও তা হলে—” পুরাতন ‘বঙ্গদর্শন’টি লইয়া প্রাণকান্ত আলোর নিকট সরিয়া বসিয়া বহিটি নাড়িয়া চাড়িয়া বলিল—“এইটি পড়ছি তা হলে শোন—বিষয়টা ভাল বলেই মনে হচ্ছে। ‘অক্ষরের প্রকৃতি ও স্বরবর্ণোচ্চারণ।’ পড়ব?”

“পড়”

প্রাণকান্ত পড়িতে লাগিল—

“অক্ষরের দুই অবস্থা—এক, লিখিত আর শব্দিত। সেই লিখিত ভাবকে বর্ণ এবং শব্দিত ভাবকে অক্ষর বলা যাইতে পারে। লিখিতাবস্থাকে বর্ণ বলার কারণ এই যে, কালো কিংবা রক্তিম কিংবা অন্য কোন বর্ণ দ্বারা তাহা লিপি করিতে হয়, আর শব্দিতাবস্থাকে অক্ষর বলার কারণ এই, তাহার ক্ষয় নাই, তাহা অবিভাজ্য। অ বলিতে যে শব্দটি হয় তাহাকে বিভাগ করা যায় না। সেই প্রকারে আ, ই, ক, খ ইত্যাদি বর্ণ উচ্চারণ করিলে যে সকল শব্দ উৎপন্ন হয় তাহারা

প্রত্যেকে অবিভাজ্য। লিখিতাবস্থাকে অক্ষর বলা যায় না, কারণ লিখিত বর্ণ অবিভাজ্য নহে, তাহা রেখাদ্বারা গঠিত, সুতরাং সেই রেখাসকলকে ইচ্ছামত বিভাগ করা যায়; কিন্তু তাহাদের শব্দিতাবস্থা বিভাজ্য নহে। অ বলিতে যে শব্দ হয়—"

বিজৃম্ভণ করিয়া বলিলাম—"এটা ভারি খটমট লাগছে। অন্য আর একটা কিছু পড়—"

প্রাণকান্ত বলিল—"এর আগের প্রবন্ধটি হচ্ছে 'প্রাচীন সামাজিক চিত্র,'—পরেরটি হচ্ছে 'রাজতপস্বিনী'—দুটোই পরচর্চ্চা। সেইজন্যে এইটে ধরেছিলাম—"

"আচ্ছা পড়া থাক তা হলে। এস, অন্য কোন বিষয় আলোচনা করা যাক।"

"সেই ভাল—কি বিষয়ে বল?"

বলিয়া সে স্মিতহাস্য করিয়া বইটি মুড়িয়া রাখিয়া দিল। তাহাকে প্রশ্ন করিলাম—"সভ্যতা বলতে তুমি কি বোঝ?" ইহার উত্তরে প্রাণকান্ত আর একটি সিগারেট ধরাইল।

তাহাকে নীরব দেখিয়া আবার আমাকেই প্রশ্ন করিতে হইল—"পাশ্চাত্য সভ্যতার আদর্শ-ই বড়, না আমাদের সনাতন প্রাচীন আদর্শ-ই বড় মনে কর তুমি? অর্থাৎ ভোগী সভ্য, না, ত্যাগী সভ্য?"

ইহার উত্তরে প্রাণকান্ত যাহা বলিল তাহা বিস্ময়জনক হইলেও প্রণিধানযোগ্য। তাহার মতে উদ্ভিদগণই পৃথিবীর মধ্যে সভ্যতম প্রাণী। উদ্ভিদের দানের উপর নির্ভর করিয়া পৃথিবীর অন্যান্য জীব জীবনধারণ করিতেছে। উদ্ভিদগণই আদিমতম এবং সভ্যতম। তাহারা শিল্পী, তাহারা সাধক, তাহারা সুন্দর, অথচ তাহারা নীরব।

আমাদের মত তাহারাও জীবনযুদ্ধে নিযুক্ত, কিন্তু সে যুদ্ধ তাহারা এত সুনিপুণভাবে করিতেছে যে তাহাতে কোন আকস্মিক ছন্দ-পতন নাই। তাহাদের জীবনযুদ্ধ একটি সুলিখিত কাব্যের মতই সুললিত। তাহা প্রচ্ছন্ন হইয়াও প্রকৃষ্ট—তাহা নিষ্ঠুর হইলেও দৃষ্টিকটু নহে।

প্রাণকান্ত উচ্ছ্বসিত হইয়া আবেগপূর্ণ ভাষায় উদ্ভিদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করিবার জন্য যে বক্তৃতা করিতে লাগিল, তাহা নিঃসন্দেহে উপাদেয়। আমি ইহা আরও ভালভাবে উপভোগ করিতাম—কিন্তু উদরের মধ্যে কেমন যেন একটা অস্বস্তি বোধ করিতেছিলাম। পেটটা ফাঁপিয়াছে। মধ্যাহ্নে গুরুপাকদ্রব্য কি আহার করিয়াছিলাম মনে করিবার চেষ্টা করিতেছি। এমন সময় দীর্ঘ বক্তৃতান্তে প্রাণকান্ত হঠাৎ থামিল।

বলিলাম—"বাঃ, বেশ বলেছ তুমি!"

"এটা কিন্তু পরচর্চ্চা পরনিন্দা দুই হল। অন্যান্য জীবদের নিন্দে করে' তবে না গাছদের বড় করলাম—" বলিয়া সে একটি উদ্গার তুলিল এবং মুখ বিকৃত করিয়া বলিল—"এঃ—একটা চোঁয়া ঢেঁকুর উঠল—। বাড়ি ফেরা যাক—।"

ঘড়িতে টং টং করিয়া আটটা বাজিল।

"এতক্ষণ পরে আটটা বাজল। এর মধ্যে বাড়ি ফিরে কি করবে? নাও আর একটা কিছু পড়—শোনা যাক। থাম আমি বেছে দিচ্ছি—"

বলিয়া আবার 'বঙ্গদর্শনে'র পাতা উল্টাইতে লাগিলাম। "নাও এইটে পড়। 'নীলাম্বরী'—একটা গল্প—"

স্মিতহাস্য করিয়া প্রাণকান্ত বলিল—"আমিও তো গোড়ায় 'নীলাম্বরী'র কথাই পেড়েছিলাম—তুমিই তো থামিয়ে দিলে—"

"কি রকম?"

"ওই যে বলছিলাম না আমাদের পাশের বাড়িতে কোলকাতা থেকে এক আপ-টু-ডেট মেয়ে এসেছেন। তিনিও নীলাম্বরী—"

"তাই নাকি? আচ্ছা, বল বল শুনি। তা না হলে তোমার রাত্তিরে ঘুম হবে না—দেখছি—"

সোৎসাহে চীৎকার করিলাম—"ওরে ভুতো, তামাক দিয়ে যা—"

সুরু হইয়া গেল।

রাত্রি এগারটার সময় বাড়ি হইতে চতুর্থবার ডাকিবার পর যখন খাইবার জন্য গাত্রোত্থান করিলাম তখন আমরা উভয়ে কলিকাতা হইতে আগত সেই নীলাম্বরী, রাধু ময়রার ভাদ্রবধূ, হরিচরণের বিবাহযোগ্যা ভগিনী, আজকালকার যুবকদের আচরণ, নিতাই ঘোষালের আঙুল-ফুলিয়া-কলা-গাছ হওয়া, গুপি ডাক্তারের চরিত্র-হীনতা, স্থানীয় অ্যামেচার নাট্যসমাজে দলাদলি এবং তাহার মূল কারণ, অনাবৃষ্টিহেতু চাষের অসুবিধা, ইটালীর অতি-বাড়, জার্মেনির যুদ্ধকৌশল, চণ্ডীখুড়োর কেলেঙ্কারী—প্রভৃতি সমস্ত আলোচনা শেষ করিয়াছি।

প্রাণকান্ত বলিল—"এইবার ওঠা যাক তা হলে—ক্ষিদেও পেয়েছে বেশ—খানিক আগে চোঁয়া ঢেঁকুর মারছিল—"

আমিও সবিস্ময়ে দেখিলাম আমারও পেটের ফাঁপ একেবারে নাই, বায়ু সরল হইয়া গিয়াছে।

আহার করিতে করিতে মনে যে দার্শনিক ধারণা হইল, তাহা সংক্ষেপত এই যে, উদ্ভিদগণ কি করে তাহা জানা নাই কিন্তু ইহা

ধ্রুব সত্য যে মানুষ পরচর্চ্চা না করিলে বাঁচিয়া থাকিতে পারে না, আর কিছু না হউক তাহার পেট ফাঁপিবে।

লীগ অব নেশন্‌স, পার্লামেণ্ট, কাউন্সিল, কংগ্রেস, সাহিত্য-সভা, ধর্ম্মসভা, পরচর্চ্চা করিবার জন্য সৃষ্ট হইয়াছে এবং পরচর্চ্চা করিতে গেলে কিঞ্চিৎ পরনিন্দাও অবশ্যম্ভাবী। ইহা না করিলে এই গুরুপাক সভ্যতা হজম করা কঠিন।

বাজে খরচ

একদা প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে হরি বসাকের পিসামহাশয় কলিকাতায় গিয়া শীত-নিবারণ-কল্পে একটি গরমের জামা প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। সেকালে পিসামহাশয়ের সৌখীন লোক বলিয়া খ্যাতি ছিল। কোট পরিধান করিয়া বাড়ি ফিরিতেই পিসামহাশয়ের বাবা পিসামহাশয়কে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, "কোটটার দাম কত পড়ল ?"

"তে—তে—তে—তেরো টাকা—"

পিসামহাশয় তোৎলা ছিলেন।

দাম শুনিয়া পিসামহাশয়ের পিতা বিস্ময়ে অবাক। তাঁহার বাক্যস্ফূর্ত্তি হইলে তিনি বলিলেন, "তে—রো টাকা! বলিস কি রে? তেরো টাকায় যে একটা গরু হয়!"

পিসামহাশয়ও ইহার যুক্তিযুক্ত উত্তর প্রদান করিয়াছিলেন।—"গ-গ-গ-গরু তো আর গা-গা-গায়ে দেওয়া যায় না—"

পিতাপুত্রের এই উত্তরপ্রত্যুত্তরে বাল্যকালে প্রচুর আনন্দ উপভোগ করিয়াছিলাম এবং মনে মনে পিসামহাশয়কেই সমর্থন করিয়াছিলাম মনে পড়িতেছে। আমি নিজেও যৌবনকালে খুব মিতব্যয়ী ছিলাম না। বরং অমিতব্যয়ী ছিলাম বলিলে সত্যের গুরুতর অপলাপ করা হইবে না। আমার যৌবনকালের সমস্ত দুষ্কৃতিগুলির পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দিবার প্রয়োজন নাই, এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে আমার মত মধ্যবিত্ত গৃহস্থ লোক প্রতি বৎসর লক্ষ্ণৌ শহরে লোক পাঠাইত কেবলমাত্র খরমুজা আনাইবার জন্য। বালক জ্যেষ্ঠ পুত্রের

আবদারে বিগলিত হইয়া একটি টাট্টু ঘোড়া যে ব্যক্তি তাহাকে কিনিয়া দিয়াছিল তাহার মাসিক আয় একশতের অধিক ছিল না—একথা অবিশ্বাস্য হইলেও সত্য। কারণ আমিই সেই বিগলিত ব্যক্তি। জ্যেষ্ঠা কন্যার বিবাহে গোরার বাদ্য আনিয়া যিনি ঋণজালে জড়িত হইয়াছিলেন তিনি অপর কেহ নন, এই শর্ম্মাই। অথচ সেই শর্ম্মাই পৌত্রের বাজে খরচ দেখিয়া আজ অগ্নিশর্ম্মা হইয়া উঠিয়াছেন এবং তারস্বরে একালের বিলাসপ্রবণতাকে গালাগালি করিতেছেন, ইহার কারণ কি ?

এই দুরূহ মনোবিকলনে ব্যাপৃত ছিলাম, এমন সময় হন্‌হন্ করিয়া বাচস্পতি মহাশয় আসিয়া দর্শন দিলেন। আসিয়াই তিনি বিনা বাক্যব্যয়ে সম্মুখস্থ চৌকিটিতে উপবেশন করিলেন। উপবেশনান্তে ট্যাঁক হইতে একটি নস্যাধার বাহির করিয়া তাহা আস্ফালন করিতে করিতে যে কয়টি বাক্য ব্যয় করিলেন সেগুলি বেশ উষ্ণ বলিয়াই মনে হইল।

"বিশুর কাণ্ডখানা দেখ একবার, দাদা! ভাল একটা নস্যদানি পাঠাতে লিখেছিলাম। এই সেই ভালর নমুনা!" কুলাঙ্গার কোথাকার।

বাচস্পতি মহাশয়ের অপেক্ষা আমি বয়ঃকনিষ্ঠ হইলেও তিনি আমাকে বরাবর দাদা সম্বোধন করিয়া সুখ পাইয়া থাকেন। ইহাতে আমি আপত্তি করি নাই। কিন্তু বিশুকে কুলাঙ্গার বলিতে আমার আপত্তি আছে। বিশু বাচস্পতি মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র। বেশ ভাল ছেলে। এম. এ. পাস করিয়া প্রফেসারি করিতেছে। তাহাকে কুলাঙ্গার বলা চলে না।

বলিলাম, "মন্দ কি নস্যদানিটা? খারাপ নয় তো!"

"আরে এরকম নস্যদানি আমার দশটা আছে। ভাল নস্যদানি একটা সখ করে পাঠাতে লিখেছিলাম—ভেবেছিলাম—চন্দন কাঠের না হোক—রূপোর কাজটাজ করা একটা পাঠাবে। না, পাঠিয়েছে সেই মোষের শিঙের! কুলাঙ্গার কোথাকার!"

বুঝিলাম, বাজে-খরচেচ্ছু বাচস্পতিকে মিতব্যয়ী বিশু অজ্ঞাতসারে আঘাত দিয়াছে।

কিছুক্ষণ নীরবে কাটিল।

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া হঠাৎ বাচস্পতি মহাশয় বলিয়া উঠিলেন, "তারা তারা, তারা তারা! এইবার উঠি দাদা। আজকালকার ছেলেদের নজরটা কেমন তাই তোমাকে দেখাতে এসেছিলাম। এই দেশেই শুনি শ্রীরামচন্দ্র পিতার আদেশে বনে গিয়েছিলেন। তারা—তারা—তারা—"

বাচস্পতি অপসৃত হইলেন।

কিছুদিন হইতে লক্ষ্য করিতেছি যতই বয়স বাড়িতেছে বাচস্পতি মহাশয়ের সখও ততই বাড়িতেছে। গত শীতকালে বালাপোষ মনোমত হয় নাই বলিয়া মধ্যম পুত্রের উপর তিনি খড়্গহস্ত হইয়াছিলেন। অর্থাৎ বিশ্লেষণ করিলে এই দাঁড়াইতেছে যে বৃদ্ধ বাচস্পতি ও আমার পৌত্র প্রায় সহধর্ম্মী হইয়া উঠিয়াছেন। আমিই বা সহসা এরূপ ঝুনা হইয়া উঠিলাম কেন? আমারই বা পুত্রের সমস্ত বাজে খরচ বাঁচাইয়া দিবার জন্য এই অহেতুকী ব্যগ্রতা কেন? ঠিক অহেতুকী অবশ্য নয়—হেতু একটা আছে। আমার বাসনা অন্যান্য খরচ কমাইয়া বর্ত্তমানে পশ্চিম দিকের ও উত্তর দিকের ঘর দুইখানা সর্ব্বাগ্রে মেরামত করাইয়া ফেলা প্রয়োজন এবং তৎপরে উত্তর দিকের বারান্দা ও পূর্ব্বদিকের বারান্দাকে সংযুক্ত করিয়া

কোণাকুণি বাহিরের দিকে একটা বারান্দা বাহির করাও আবশ্যক। বাহিরের লোক আসিলে বসিতে দিবার সুবিধা হইবে। বর্ত্তমানে নানা প্রকার অসুবিধা ঘটিতেছে। সিনেমা দেখিয়া, উপন্যাস কিনিয়া, মধুপুরে বেড়াইতে গিয়া যে সকল বাজে খরচ হইতেছে সেগুলি বাঁচাইয়া অনায়াসেই এই প্রয়োজনীয় কর্ম্মগুলি সুনিষ্পন্ন হইতে পারে। কিন্তু আমার কথায় কেহ কর্ণপাত করে না।

সর্ব্বোপরি আমার নাতিটি এই বয়সে এমনই বিলাসী হইয়া উঠিয়াছে যে তাহা কহতব্য নয়। সুযোগ পাইলেই সমগ্র কলিকাতা শহরটাই সে কিনিয়া পকেটস্থ করিয়া ফেলিবে বলিয়া মনে হইতেছে। ছোকরা এই তো সবে আই. এ. পাস করিয়া বি. এ, পড়িতে সুরু করিয়াছে—আজ সকালে তাহার পকেটে দেখি চকচকে এক সিগারেট কেস এবং তাহার ভিতর ঠাসা অত্যন্ত দামী সিগারেট। সিগারেট-কেসটি কাড়িয়া লইয়া বহু কটূক্তি করিয়া তাহাকে দূর করিয়া দিয়াছি।

এখন নিজেই নিজেকে প্রশ্ন করিতেছি,—"তোমার এ দুর্ম্মতি কেন? উহাদের বাজে খরচ কমাইবার জন্য তোমারই বা এত শিরঃপীড়া কিসের?"

বলা বাহুল্য, প্রশ্ন কঠিন ও চিন্তাসাপেক্ষ।

সুতরাং ভূতোকে তামাক সাজিতে বলিলাম।

পূর্ণ দুইটি ঘণ্টা মাথা ঘামাইবার পর দেখিলাম যে চিন্তা সমুদ্র মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছে এবং তাহাতে যে শ্রেণীর তরঙ্গমালা দেখা যাইতেছে সেগুলির সংক্ষিপ্ততম বর্ণনা দিতে গেলেও 'উত্তাল' বিশেষণটি ব্যবহার করিতে হয়। ক্ষুদ্র বুদ্ধির ভেলা উত্তালোর্ম্মিসমাকুল চিন্তা-সাগরে বিপর্য্যস্ত হইয়া নাস্তানাবুদ হইবার যোগাড় হইল। এমন

সময় বাগানের মালী আসিয়া বলিল, "বাবু, চারাগাছটাকে একটু সরিয়ে পুঁততে হবে। তা না হ'লে চারাটা মারা যাবে—"

বলিলাম, "চল দেখি।"

গিয়া দেখিলাম, বৃদ্ধ আমগাছটির নীচে তাহারই আঁটি হইতে উদ্ভূত যে চারাগাছটি হইয়াছে তাহাকে সত্যই স্থানান্তরিত করা প্রয়োজন। কারণ দেখিলাম বসন্ত সমাগমে বৃদ্ধ আমগাছটি নব-পল্লব-মুকুলে যতটা অলঙ্কৃত হইয়া উঠিয়াছে চারা গাছটি ততটা পারে নাই। তাহাতেও দুই চারিটা কিশলয় না গজাইয়াছে এমন নয়—কিন্তু বুড়া গাছটার বাহুল্যের নিকট তাহা নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। বৃদ্ধের আওতায় পড়িয়া এই কিশোর চারাগাছটি এমন মধুমাসেও কেমন যেন ম্রিয়মাণ হইয়া রহিয়াছে।

অকস্মাৎ যেন জ্ঞানচক্ষু খুলিয়া গেল।

উন্মীলিত জ্ঞানচক্ষু মেলিয়া দেখিলাম আমি এক বিরাট যুদ্ধক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া আছি। শুধু দাঁড়াইয়া আছি নয়—যুদ্ধ করিতেছি এবং এই যুদ্ধে আমি আমার পুত্র ও পৌত্রের প্রতিদ্বন্দ্বী। নিজের ষোল আনা সুখসুবিধা লাভ করিবার জন্য তাহাদের সুখসুবিধাকে লক্ষ্য করিয়া নীতিকথার গোলাগুলি ছুঁড়িতেছি। দেখিলাম, সকলেই নিজের সুখান্বেষণে তৎপর এবং অপরের সুখসুবিধার প্রতি নির্ম্মমভাবে উদাসীন অথবা কটাক্ষশীল। আমার পুত্র মধুপুরে গিয়া সুখ পাইতেছেন, আমার পৌত্র দামী সিগারেট ফুঁকিয়া সুখ পাইতেছেন এবং আমি বর্ত্তমানে বসতবাটির জীর্ণ সংস্কার করাইয়া তৃপ্তি পাইতেছি। উপরন্তু এই তৃপ্তিলাভের অন্তরায় বলিয়া এখন কন্যার বিবাহে গোরার বাদ্য আনাটা অপব্যয় বলিয়া মনে হইতেছে এবং খরমুজা-ভোজনের নানাবিধ দোষ সম্বন্ধে কৃতনিশ্চয় হইয়াছি।

অর্থাৎ বর্ত্তমানে আমার সুখ, আমার পুত্রের সুখ এবং আমার পৌত্রের সুখ পরস্পরবিরোধী। সুতরাং যুদ্ধ বাধিয়াছে। এই যুদ্ধে আমার সম্বল নীতিকথা, আমার পুত্রের সম্বল উপার্জ্জনক্ষমতা এবং আমার পৌত্রের সম্বল সদ্যলব্ধ যৌবন।

বাচস্পতিও দেখিলাম যোদ্ধৃবেশে ইতস্তত ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। অতি অল্প বয়সে পিতৃবিয়োগ হওয়াতে সংসারের গুরুভার তাঁহার স্কন্ধে পড়ে এবং যৌবনকালেই তাঁহাকে সংসারী সাজিতে হয়। সেই যৌবনকাল হইতেই বসতবাটি-মেরামতরূপ সুখ নানাভাবে উপভোগ করিয়া বাচস্পতি এখন পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছেন—ওসবে তাঁহার আর রুচি নাই। যে সব সুখ তিনি ভোগ করিতে পান নাই এই বৃদ্ধ বয়সে সেই সবের জন্য তিনি লালায়িত। নস্যের ডিবা ও বালাপোষ লইয়া তাই তিনি স্বপ্নরচনা করিতেছেন এবং আত্মসুখমগ্ন বিশু জ্ঞাতসারে ও অজ্ঞাতসারে তাহাতে বাধা সৃষ্টি করিতেছে বলিয়া কুপিত বাচস্পতি শাস্ত্রীয় গোলাগুলির আঘাতে তাহাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছেন।

দেখিলাম—এই যুদ্ধক্ষেত্রে আমি, বাচস্পতি, আমার পুত্র, পৌত্র এবং সংসারের সকলেই আপন আপন কামনা-ট্রেঞ্চে আত্মগোপন করিয়া নানা কৌশলে পরস্পরকে কাবু করিবার চেষ্টা করিতেছি এবং কালক্রমে এক ট্রেঞ্চ পরিত্যাগ করিয়া অন্য ট্রেঞ্চে গিয়া হাজির হইতেছি। সকলেই আমরা জিঘাংসাপরায়ণ সৈনিক। কেহ পুরাতন বন্দুক হস্তে বীরত্ব করিতেছি—কেহবা অতি-আধুনিক বোমাহস্তে গ্যাস-মাস্ক পরিধান করিয়া আস্ফালন করিতেছি।

এইটুকুই যা তফাৎ।

যতই চিন্তা করিতে লাগিলাম ততই নিজের সৈনিক মুর্ত্তি নিজের নিকট প্রকট হইতে লাগিল। ক্রমশ ইহাও উপলব্ধি করিলাম যে বাজে খরচ জিনিসটা শুধু যে অনিবার্য্য তাহা নয়—অপরিহার্য্য। যাহাকে আমরা বাজে খরচ বলি তাহা নিতান্তই প্রয়োজনীয়। ওই যে দুরন্ত শিশুটা ক্রমাগত লম্ফঝম্প করিয়া শক্তির অপচয় করিতেছে স্থূল আপাতদৃষ্টিতে দেখিলে তাহা অপব্যয় বলিয়া মনে হইতে পারে কিন্তু দৃষ্টি একটু সূক্ষ্ম করুন, দেখিবেন লম্ফঝম্প ব্যতিরেকে ওই শিশুর পূর্ণ স্বাস্থ্যলাভ অসম্ভব। খানিকটা বাজে খরচ না করিলে এই পৃথিবীতে কোন বৃহৎ ব্যাপারই সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হইতে পারে না। যুদ্ধের কথাই ধরা যাউক। এমন কোন যুদ্ধের নাম করিতে পারেন যাহাতে সৈন্যসামন্ত, গোলাগুলি, রসদপত্র নিক্তির ওজনে আয়োজিত হইয়াছে? এতটুকু অপব্যয় হয় নাই? প্রয়োজনের অধিক আয়োজন না করিলে কোন জিনিসই সুসম্পন্ন হয় না—তা সে যুদ্ধেই হউক আর উৎসবেই হউক। পঁচিশ জনকে নিমন্ত্রণ করিলে অন্ততপক্ষে পঁয়ত্রিশ জনের মত ব্যবস্থা করিতে হয়—একথা কে না জানে?

আরও একটা কথা। আপাতদৃষ্টিতে যেগুলি বাজে খরচ বলিয়া মনে হয় আসলে সেগুলি মোটেই বাজে খরচ নয়। সেগুলির বিনিময়ে আমরা এমন বহু মহার্ঘ জিনিস লাভ করি যাহার মূল্য এই জীবনে নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর নয়। আমার মত নগণ্য ব্যক্তি যে এত বিভিন্ন লোকের স্নেহলাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে তাহার কারণ কি আমার দিলদরিয়া মেজাজ নয়! সারা জীবন আমি যদি হিসাব করিয়া খরচ করিতাম, ওজন করিয়া কথা বলিতাম তাহা হইলে এক পরমকারুণিক পরমেশ্বর ব্যতীত অপর কেহ আমার দিকে ফিরিয়া চাহিত কিনা সন্দেহ এবং মনুষ্যসঙ্গবর্জ্জিত হইয়া

কেবলমাত্র পরমেশ্বরের মুখ চাহিয়া এই জটিল সামাজিক জীবন যাপন করিতে পারা আমার পক্ষে কিরূপে সম্ভবপর হইয়া উঠিত তাহা ভাবিতে গিয়া ভীত হইয়া উঠিতেছি। লাভ আছে বই কি! আমার বেশ মনে পড়িতেছে, জনৈক উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারীকে খরমুজা খাওয়াইয়াছিলাম বলিয়াই আমার জ্যেষ্ঠ পুত্রটির ভাল চাকুরিটি জুটিয়াছে।

আমার গুণধর পৌত্রটি দামী সিগারেট খাইয়া ও বিতরণ করিয়া কোন্ সমুদ্রে কি ভাবে জাল ফেলিয়া কোন্ রত্ন আহরণ করিবে তাহা কে বলিতে পারে? হয়তো সে নিজেও জানে না।

এই দার্শনিক চিন্তার সূত্র ধরিয়া আর একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম। বাজে খরচ চিরকাল করা চলে না। একদিন তাহা বন্ধ করিতেই হয়—যেদিন মৃত্যু হয়। তৎপূর্ব্বে যাহার যাহা খুশি করুক—এই খুশির খরস্রোতে বাধা দিতে গেলে ঐরাবতও ভাসিয়া যাইবে। সুতরাং অনর্থক নাতিটার মনোকষ্টের কারণ হই কেন? সিগারেট-কেসটি ফিরাইয়া দিব। কিন্তু সিগারেট-কেসের দিকে চাহিয়া চক্ষু-স্থির হইয়া গেল। সিগারেট-কেস খালি। অন্যমনস্ক হইয়া একটির পর একটি নিজেই সবগুলি শেষ করিয়া ফেলিয়াছি।

* * * *

গভীর রাত্রে চোরের মত পা টিপিয়া টিপিয়া নাতির ঘরে প্রবেশ করিলাম এবং অতি সন্তর্পণে তাহার পকেটে সিগারেট-কেসটি সিগারেট সমেত রাখিয়া আসিয়া পরম তৃপ্তিলাভ করিলাম। বাজার হইতে নূতন সিগারেট কিনিয়া দিতে হইল—ইহা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না।

খোসামোদ

চক্ষু দুইটির খোসামোদ করিতে হইবে। নিতান্তই বাঁকিয়া দাঁড়াইয়াছে, সেক দেওয়া প্রয়োজন। ভৃত্য ভূতোকে গরম জল আনিতে বলিয়াছি, কিন্তু আধ ঘণ্টা হইয়া গেল শ্রীমানের এখনও দর্শন নাই, বুঝিতেছি, তাঁহাকেও খোসামোদ করা আবশ্যক। তাহা না করিলে···হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাহাকে বেতন দিই বই কি! কিন্তু বেতনভুক্ ভৃত্যের নির্ম্মম নিক্তি-নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্যকর্ম্ম আমার পছন্দ হয় না। আমি কর্ত্তব্যের সঙ্গে সামান্য একটু মমতাও কামনা করি, এবং সেই মমতাটুকু লাভ করিতে হইলে এমন কিছু তাহাকে দেওয়া প্রয়োজন মনে করি যাহা বেতনাতীত, যাহা তাহার আইনসঙ্গত প্রাপ্য অপেক্ষা অধিক। অর্থাৎ তাহাকেও খোসামোদ করিতে হয়। যদি তাহাকে এখন ডাকিয়া ধমকাই এবং প্রশ্ন করি যে গরম জল এখনও হইল না, তাহার উত্তরে সে এমন জটিল কিছু একটা বলিবে যে আমার আর কোন কথা চলিবে না। এমন কিছু বলিবে যাহা নিতান্ত ন্যায়সঙ্গত ও যাহার বিরুদ্ধে কোন ভদ্রলোকের কোন অভিযোগ থাকিতে পারে না। সে হয়তো বলিবে, গিন্নীমা কয়লার পয়সা ঠিক সময়মত দেন নাই বলিয়া কয়লা আনিতে দেরী হইয়াছে—উনান সেইজন্য এখনও ধরে নাই। স্টোভ ধরাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে, কিন্তু স্টোভটি তো জ্বলিতেছে না। বোধ হয় সারানো দরকার—বারো আনা পয়সা চাই।

এই জাতীয় কোন একটা উক্তির দ্বারা সে আমাকে নীরব

করিয়া দিবে, এবং ধমকের প্রতিশোধ স্বরূপ হয়তো আরও দেরি করিতে থাকিবে।

উহাতে সুখ নাই।

ওসব না করিয়া যদি তাহার একটু খোসামোদ করি, দেখিবেন যাদুমন্ত্রবৎ কাজ হইবে। যদি এখনই তাহাকে ডাকিয়া বলি, বাবা ভূতনাথ, তোমার দ্বিতীয় পক্ষের বউটিকে আমি রূপার পৈঁচা গড়াইয়া দিব মনস্থ করিয়াছি; তুমি আর কালবিলম্ব করিও না, আজই নীপু স্যাকরাকে খবর দাও। অথবা, যখন সে পাশের ঘরে কাজ করিতে থাকিবে তখন যদি তাহাকে শুনাইয়া শুনাইয়া অপর কাহারও কাছে তাহার অজস্র প্রশংসা করিতে থাকি, তাহা হইলে দেখিবেন ভূতনাথের কর্ত্তব্যবোধ অন্য মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। তখন বাড়িতে তাড়াতাড়ি গরম জল করা অসম্ভব হইলে সে পাশের বাড়ির পাচকের হাতে পায়ে ধরিয়া তাহাদের উনানে আমার জন্য জল গরম করিয়া আনিবে। তাহাও অসম্ভব হইলে সে অন্য উপায় উদ্ভাবন করিবে—যেমন করিয়া হউক যত শীঘ্র সম্ভব সে গরম জল আনিয়া দিবেই। বেতনভুক্ ভূতনাথ আমার জন্য এতটা করিবে না, কিন্তু খোসামোদ-বিগলিত ভক্ত ভূতনাথ করিবে।

সেও আনন্দ পাইবে, আমিও আনন্দ পাইব।

এমন একদিন ছিল যখন খোসামোদ করাটাকে ঘৃণা করিতাম, মনে করিতাম উহা অত্যন্ত নীচ কার্য্য। এখন বয়স বাড়িয়াছে, আজ বুঝিতেছি যে খোসামোদ করাটা নীচ কার্য্যই হউক বা উচ্চ কার্য্যই হউক, উহাই জীবনের সর্ব্বপ্রধান কার্য্য। জ্ঞাতসারে ও অজ্ঞাতসারে

জীবনের প্রতি পদক্ষেপে উহাই করিতেছি এবং উপলব্ধি করিতেছি যে ঠিক স্থানটিতে ঠিক সময়ে ঠিক তৈলটি নিষেক না করিলে সমস্ত লণ্ডভণ্ড হইয়া যায় এবং এমন একটা অস্বস্তিকর 'পরিস্থিতি'র উদ্ভব হয় যাহা নিতান্তই অবাঞ্ছনীয়। সেই 'পরিস্থিতি'র মধ্যে আর যাহাই সুলভ হউক আনন্দ বস্তুটি সুলভ নহে।

আমি আনন্দকামী। সুতরাং আমি খোসামোদ করিতে ও খোসামোদ পাইতে ভালবাসি। এ বিষয়ে আমি নিরঙ্কুশ। আমি হনূমানকে কন্দর্পকান্তি বলিয়া অভিনন্দন করিতে কিছুমাত্র ইতস্তত করিব না যদি সে আমার কবিতাগুলির সুখ্যাতি করে। এই আনন্দটুকু লাভ করিবার জন্য কত রাসভকে সুকণ্ঠ এবং কত বানরকেই সুকান্তি বলিয়াছি তাহার আর ইয়ত্তা নাই। মিথ্যাভাষণ? হয়তো। মিথ্যাকে আশ্রয় করিয়া কিন্তু সুখ পাই। যে রমণীটিকে বাহুপাশে বাঁধিয়া সোহাগ করি, আবেগকম্পিত কণ্ঠে, প্রণয়পেলব ভাষায়, অলঙ্কৃত বন্দনাগুঞ্জনে যাহার শ্রবণপটহ স্পন্দিত করিয়া তুলি তাহাকে আমি সমালোচকের দৃষ্টিতে দেখিব না। তাহার সম্বন্ধে আমার সত্য ধারণাটি চিরকাল অপ্রকাশিতই থাকিয়া যাইবে। মনে মনে তাহার নানা দোষ সম্বন্ধে সচেতন থাকিলেও মুখে তাহাকে বলিব, তুমি অনুপমা, অনবদ্যা, অনিন্দনীয়া। তোমার সকল কর্ম্ম শোভন, সকল যুক্তি অখণ্ডনীয়, সকল চিন্তা সারবান। তোমার পরিচয় লাভ করিয়া আমি কৃতার্থ হইয়া গিয়াছি।

পরিবর্ত্তে সেও আমার কর্ণকুহরে ওই প্রকার অসম্ভব, অসত্য অত্যুক্তিপূর্ণ প্রলাপ বচন বর্ষণ করিবে।

ফলে—উভয়ে আনন্দসাগরে ভাসিতে থাকিব।

প্রথম যৌবনে কিছুই বুঝিতাম না। বুঝিতাম না যে 'খোসামোদ

করাটা হীন মনোবৃত্তি', এই বুলি আওড়াইয়া আমি আমার 'অহং'টার খোসামোদই করিতাম। তখন বুঝি নাই—এখন বুঝিতেছি এবং প্রথম যৌবনের সেই অবুঝ আমি'টার প্রতি অত্যন্ত অনুকম্পা হইতেছে। সেই উদ্ধত অশিষ্টটা সকলকে স্পষ্ট কথা শুনাইয়া সত্যভাষণের গর্ব্বে নাক উঁচু করিয়া প্রচুর সুখ পাইত, অর্থাৎ নিজের 'অহং'টার প্রচুর খোসামোদ করিত। খোসামোদ না করিলে সুখ পাওয়া যায়? তোষামোদ ও তুষ্টি একই ধাতুতে গড়া, এ কথা মুগ্ধবোধ খুলিলেই দেখিতে পাইবেন। শুধু একের তুষ্টি নয় উভয়েরই তুষ্টি। সূক্ষ্ম বিচার করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবেন যে, বিমল আনন্দ পাইতে হইলে তোষামোদ করিতেই হইবে—তা সে ভূতোকেই হউক, ভগবানকেই হউক, কোন নারীকেই হউক বা নিজের 'অহং'কেই হউক। খোসামোদ করিয়া পরিবর্ত্তে খোসামোদিত হইলেই আনন্দের উৎপত্তি। সকলেই এইরূপ একটা না একটা কাহাকেও ধরিয়া আনন্দ লাভ করিতেছেন। অথচ, আশ্চর্য্যের বিষয়—সকলে সে কথা জানেন না।

আসল গল্পটি এইবার শুনুন।

আমার চক্ষু দুইটি চটিয়া অত্যন্ত লাল হইয়া আছে এবং করকর করিতেছে। অবশ্য এ বিশ্বাস আমার আছে যে সেকরূপ খোসামোদ দিয়া তাহাদের শান্ত করিয়া ফেলিতে পারিব। খানিকক্ষণ বসিয়া নিবিষ্ট মনে গরম গরম সেক দিলেই উহারা ঠাণ্ডা হইয়া যাইবে। বেচারাদের দোষ নাই, চটিবার যথেষ্ট সঙ্গত কারণ আছে।

নিয়তির এমনই পরিহাস যে কালই আবার ত্রিপুরাচরণের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। যদিও বর্ত্তমান আখ্যায়িকার পক্ষে

ত্রিপুরাচরণ অবান্তর, তথাপি তাহার সহিত আমার যে কথাবার্ত্তা হইয়াছিল তাহা শুনিলে আমার বক্তব্য আরও সুপরিস্ফুট হইবে। ত্রিপুরাচরণকে আমি খোসামোদ করিয়া সুখ পাই। ত্রিপুরাচরণ মুসোলিনী-ভক্ত। কাল সকালে সে রুখিয়া আসিয়া উপস্থিত। সে আকারে ক্ষীণ—কিন্তু তাহার ব্যবহার ও মতামত প্রচণ্ড। কিছু-ক্ষণের মধ্যেই সে টেবিল চাপড়াইয়া, চীৎকার করিয়া জমাইয়া তুলিল। তাহার বক্তব্য সংক্ষেপে এই যে দেশের প্রায় সকলেই গোল্লায় গিয়াছে—যে দুই চারিজন অবশিষ্ট আছে তাহারাও গমনোন্মুখ। ইহাদের বাঁচাইতে হইলে দেশের আইন বদলানো দরকার! সে পরিবর্ত্তিত আইনের আভাস যাহা দিল তাহা এইরূপ। প্রথমেই সিনেমা ও থিয়েটারের সংস্কার প্রয়োজন। এ দেশে সিনেমা ও থিয়েটার সম্পর্কিত যাহা কিছু ঘটিতেছে সমস্তই লোম-হর্ষণকর। এই সব লোমহর্ষণকর ব্যাপার হইতে মুক্তি পাইতে হইলে আইন করিয়া ইহাদের প্রত্যেককে গুলি করিয়া মারিয়া ফেলা কর্ত্তব্য। প্রথমে আইন করিয়া সিনেমা ও থিয়েটারের সমস্ত আসবাবপত্র পুড়াইয়া ফেলিতে হইবে। তৎপরে সমস্ত অভিনেতা অভিনেত্রীদের, সমস্ত প্রযোজকদের, সমস্ত গ্রন্থকারদের, সমস্ত দর্শকদের—সকলকে তোপের মুখে দাঁড় করাইয়া উড়াইয়া দিলে তবে এ বিষয়ের একটা সুরাহা হইতে পারে—তাহার পূর্ব্বে নয়।—এই বলিয়া টেবিলে একটি মুষ্ট্যাঘাত করিয়া ত্রিপুরাচরণ তাহার বক্তব্য শেষ করিল এবং তাহার পর আমার দিকে ফিরিয়া বলিল, তুমি কি বল?

অসঙ্কোচে বলিলাম, নিশ্চয়, সব মেরে ফেলা উচিত।

বন্ধু কথঞ্চিৎ শান্ত হইল।

তাহার পর বলিল, আচ্ছা, এই সাহিত্যিকগুলোকে নিয়ে কি

করা যায় বল তো? তোমার এবং আমার লেখা ছাড়া বাকি সব তো রাবিশ! এই বাজে সাহিত্যিকগুলোকে নিয়ে কি করা উচিত?

এ সম্বন্ধে তাহার মতামত আমার ঠিক জানা ছিল না।

দ্বিধাভরে বলিলাম, একটু ভেবে বলতে হবে—প্রায় এক জাতেরই লোক অবশ্য সব—

ত্রিপুরাচরণ ক্ষেপিয়া উঠিল।

এতে আর ভাবাভাবি কি? ও বেটাদের সাফ করে' ফেলা উচিত।

আমি তাড়াতাড়ি বলিলাম, আরে সে কথা কে অস্বীকার করছে! ভাবনা তার জন্যে নয়। ভাবছি এদের গুলি করা উচিত, না শূলে দেওয়া উচিত।

ত্রিপুরা বোকা নয়।

বলিল, ঠাট্টা করছ নাকি?

আমি গম্ভীরভাবে ভর্ৎসনামিশ্রিত অনুযোগের সুরে বলিলাম, পাগল! এ বিষয়ে যে কোন মার্জ্জিতরুচি লোক তোমার সঙ্গে একমত হবে। দুঃখ কি জান ভাই, আমাদের স্বাধীন দেশে জন্মানো উচিত ছিল। আমাদের কি এদেশে মানায়?

এমন সময় ঘড়িটা ঢং ঢং করিয়া বাজিয়া আমাকে বাঁচাইল।

ত্রিপুরা উঠিয়া পড়িল এবং বলিয়া গেল, সন্ধ্যার সময় সুবিধা হইলে আসিবে। এখন আপিসের সময় বসিয়া আড্ডা দেওয়া চলে না।

ত্রিপুরাচরণ যাওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই পীতাম্বর খুড়ো আসিয়া হাজির। হস্তে এক নিমন্ত্রণপত্র।

পাড়ার 'বীণাপাণি-মিলন-মন্দির' অদ্য থিয়েটার করিবে।

পীতাম্বর খুড়ো, বিশু সরকার, দামোদর বাঁড়ুজ্জে, দীনু বোস প্রভৃতি চাঁই চাঁই বৃদ্ধগণ ইহার পৃষ্ঠপোষক।

পীতাম্বর খুড়ো পত্রটি আমার হস্তে দিয়া বলিলেন, যাচ্ছ তো?

স্মিত হাস্যে কহিলাম, নিশ্চয়।

পীতাম্বর খুড়ো সোৎসাহে বলিলেন, খুব ভাল বই। ফুল রিহার্সলের দিন গেছলাম আমি। চমৎকার দাঁড় করিয়েছে। যেও—বুঝলে? ঠিক আটটায় ড্রপ উঠবে।

হ্যাঁ, নিশ্চয় যাব।

পীতাম্বর খুড়ো চলিয়া গেলেন।

সন্ধ্যার সময় বাহির হইয়া পড়িলাম।

ত্রিপুরাচরণকে যাহাই বলি না কেন, আসলে আমার থিয়েটার সিনেমা দেখিতে ভালই লাগে— তা সে যত কদর্য্যই হউক। কদর্য্য-তার মধ্যেও নানা রসের উপাদান পাই। তাছাড়া পীতাম্বর খুড়োকেই বা চটাই কেন? অত আহ্লাদ করিয়া নিমন্ত্রণ করিয়া গেলেন। যাইবার প্রাক্কালে বাড়িতে বলিয়া গেলাম যে ত্রিপুরাচরণ যদি আসে তাহাকে যেন বলা হয় আমি পূজা করিবার জন্য শিবমন্দিরে গিয়াছি। ফিরিতে রাত হইবে। ত্রিপুরাচরণকেও অনর্থক চটাইয়া লাভ নাই।

থিয়েটারে গিয়া দেখিলাম, আয়োজনের কোন ত্রুটি নাই। সমস্ত হলটা দর্শকবৃন্দে পরিপূর্ণ হইয়া গম গম করিতেছে। পীতাম্বর খুড়ো সম্বর্দ্ধনা করিয়া আমাকে বসাইলেন। নিজেও পার্শ্বে উপবেশন করিলেন। সম্মুখেই দেখিলাম দীনু বোস, দামোদর বাঁড়ুজ্জে, হারাণ পালিত প্রভৃতি প্রবীণ মহাশয়গণ সারি সারি বসিয়া আছেন।

আমার এক পার্শ্বে পীতাম্বর খুড়ো, অন্য পার্শ্বে বিশু সরকার।

ড্রপ আটটার সময় উঠিবার কথা—উঠিল দশটায়।

এই দুই ঘণ্টা কাল আমরা ইতিহাস চর্চ্চা করিলাম। দীনু বোস প্রাচীন ব্যক্তি। তিনি শুনিয়াছি সেকালে 'সীতার বনবাস' নাটকে রামের ভূমিকায় অদ্ভুত কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। তাছাড়া তিনি গিরিশ ঘোষ, অর্দ্ধেন্দু মুস্তোফী প্রভৃতি মহাত্মাগণের অভিনয় বহুবার দেখিয়াছেন। সুতরাং অভিনয়-প্রসঙ্গে দুই চারি কথা বলিবার তিনি অধিকারী। তিনি বলিলেন যে সাগরের সঙ্গে বরং গোষ্পদের তুলনা চলিতে পারে, কিন্তু উক্ত স্বর্গীয় মহাত্মাগণের সহিত আধুনিক অভিনেতাদের তুলনা পর্য্যন্ত করিতে তিনি রাজি নহেন।

যত সব জোচ্চোর ফেরেব্‌বাজ কোথাকার—

এই বলিয়া ঘূর্ণিত লোচনে তিনি একটি মোটা সিগার ধরাইলেন।

পীতাম্বর খুড়ো, বিশু সরকার, দামোদর বাঁড়ুজ্জে, হারাণ পালিত সকলেই তাঁহার সহিত একমত হইলেন। আমিও হইলাম।

এইজাতীয় আলোচনায় দুইটি ঘণ্টা হাওয়ার মত উড়িয়া গেল। ড্রপ উঠিল।

নাটকটি করুণ রসাত্মক।

কিন্তু দীনু বোসের কথাই ঠিক—আজকালকার ছোকরারা অভিনয়ের 'অ' পর্য্যন্ত জানে না। এমন করুণ নাটক অভিনয়ের দোষে হাস্যকর হইয়া উঠিয়াছে। পুরুষ মানুষেরা গোঁফ দাড়ি কামাইয়া স্ত্রীলোক সাজিয়াছে—মনে হইতেছে যেন কতকগুলা হিজড়া। যে নায়িকার প্রেমে পাগল হইয়া নায়ক শেষ পর্য্যন্ত আত্মঘাতী হইল তাহাকে হঠাৎ দেখিলে যে কোন লোক প্রথমে ভয় পাইবে এবং পরে হাসিয়া ফেলিবে।

খুব জমিয়া উঠিয়াছে।

অর্থাৎ করুণরস চরম হাস্যরসে পরিণত হইয়াছে। সকলে হো-হো করিয়া কেন হাসিতেছে না লক্ষ্য করিতে গিয়া হঠাৎ সম্মুখের চেয়ারটায় নজর পড়িল। দেখিলাম, দীনু বোস হাপুস নয়নে কাঁদিতেছেন।

পার্শ্বে ফোঁস ফোঁস শব্দ শুনিয়া ঘাড় ফিরাইয়া দেখি, পীতাম্বর খুড়ো কোঁচার খুঁটটা চোখে দিয়া অশ্রুমোচন করিতেছেন। কি সর্ব্বনাশ, অপর পার্শ্বে উপবিষ্ট বিশু সরকারের চক্ষু দুটিও সজল।

এ কি হইল!

কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখিলাম চতুর্দ্দিকে সকলেই কাঁদিতেছে। দীনু বোস তো কাঁদিয়া একেবারে কাদা হইয়া গেলেন। আমারই চোখে এক বিন্দু জল নাই—বরং আমার হাসি পাইতেছে।

অত্যন্ত অশোভন ব্যাপার।

ক্রমে সকলেই দেখিলাম কাঁদিতে কাঁদিতে আমার দিকে এক একবার আড়নয়নে চাহিয়া দেখিতেছেন। সে চাহনির অর্থও অতিশয় প্রাঞ্জল—'লোকটা আচ্ছা পাষাণ তো! সকলে কাঁদিয়া অস্থির হইয়া গেল—এ বেটার চোখে এক ফোঁটা জল নাই!'

ভয়ানক অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিলাম।

রঙ্গমঞ্চের দিকে চাহিলেই হাসি পাইতেছে, অথচ চতুর্দ্দিকে সকলেই রুদ্যমান। মহা বিপদ,—কি করি!

এমন সময় বিপদতারণ মধুসূদন মাথায় একটি বুদ্ধি দিলেন।

পকেটে নস্য ছিল। তাহাই বাহির করিয়া নাকে দিবার ছলে চোখে দিলাম। সঙ্গে সঙ্গে দরবিগলিত ধারা!

সমস্ত রাত থিয়েটার চলিল, সকলের সঙ্গে পাল্লা দিয়া আমি সমস্ত রাত্রি সমানে অনর্গল চোখের জল ফেলিলাম এবং এ কথাও

অকপটে স্বীকার করিতেছি যে, চোখ যদিও জ্বালা করিতেছিল অন্তরে প্রচুর আনন্দলাভ করিলাম।

দীনু বোস, দামোদর বাঁড়ুজ্জে, হারাণ পালিত, পীতাম্বর খুড়ো—সকলেই অশ্রুবিসর্জ্জন ব্যাপারে আমার 'সাহিত্য' লাভ করিয়া পরম সন্তুষ্ট হইলেন।

এখন চক্ষু দুইটির তোয়াজ করা প্রয়োজন।

ভূতনাথ গরম জলও আনিয়া হাজির করিয়াছে।

ভূতনাথকে বলিলাম, ওরে, তোর নতুন বউকে পৈঁচে গড়িয়ে দেব ভেবেছি—নীলু স্যাকরাকে একবার খবর দে।

গরম তূলোটা সাগ্রহে নিংড়াইতে নিংড়াইতে ভূতনাথ বলিল, এখন আমার মরবার অবসর নেই, হুজুর। বাসনপত্তর কিচ্ছু মাজা হয় নি এখনও। পরে যাব কোন এক সময়ে—

সানন্দে তাহার মুখের প্রসন্নতাটুকু লক্ষ্য করিলাম।

ভূতনাথ ভক্তিভরে আমার চোখে সেক দিতে লাগিল।

বাল্যকালে একটা গল্পে পড়িয়াছিলাম যে, এক বৃদ্ধ সকলকে সন্তুষ্ট করিতে গিয়া নিজের গর্দ্দভটি হারাইয়াছিলেন। গর্দ্দভটি হারাইয়াছিলেন সত্য কথা,—কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে যে আর একটি পরম বস্তু লাভ করিয়াছিলেন সে সম্বন্ধে গ্রন্থকার কিছু বলেন নাই। সে বস্তুটি আনন্দ—পরম আনন্দ। যেসব বুদ্ধিমান ব্যক্তি নিজেদের গোঁ-ভরে কাহারও মতামতে কর্ণপাত না করিয়া চলেন তাঁহাদেরও আমি শ্রদ্ধা করি। কিন্তু মাঝে মাঝে আমার কেমন সন্দেহ হয় যে, জীবনে সত্যকার আনন্দরস তাঁহারা হয়তো পাইলেন না—গর্দ্দভটাকে আঁকড়াইয়াই জীবনটা তাঁহাদের কাটাইয়া দিতে হইল।

স্থূল-সূক্ষ্ম

সুপ্রসিদ্ধ সেতারী এনায়েৎ খাঁ সুরবাহারে বাগেশ্রী আলাপ করিতেছেন। ইহার পর রবীন্দ্রনাথ তাঁহার অনিন্দনীয় কণ্ঠে স্বরচিত একটি কবিতা আবৃত্তি করিবেন। তাহার পরই স্বনাম-ধন্য ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁর বেহালা এবং তৎপরেই সুপরিচিত অন্ধগায়ক কৃষ্ণচন্দ্র দে মহাশয়ের কীর্ত্তন হইবার কথা।

এতদ্ব্যতীত আরও অনেক প্রসিদ্ধ এবং অপ্রসিদ্ধ গুণীগণ সমবেত হইয়া রহিয়াছেন—নাম করিয়া সময় নষ্ট করিতে চাহি না। এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে স্ব স্ব ক্ষেত্রে ইঁহারা সকলেই কৃতী।

এত গুণী সমাগম সত্ত্বেও আমরা কিন্তু নিতান্ত নির্ব্বিকার চিত্তে অত্যন্ত ঘরোয়াভাবে রহিয়াছি—কোন প্রকার উত্তেজনা নাই। ইঁহাদের মধ্যে যে কোন একজন আসিলেই যথেষ্ট চাঞ্চল্য-সৃষ্টি হওয়ার কথা, কিন্তু এতগুলি বিখ্যাত গুণী একত্রিত হওয়া সত্ত্বেও কোন উৎসব নাই। কোন 'হল' পুষ্পমাল্যে সুসজ্জিত হয় নাই—স্বাগত-সঙ্গীত গাহিবার জন্য তালিমপ্রাপ্ত বালিকাদলও দেখা যাইতেছে না। কোন জনতা নাই—অভিনন্দন নাই—কিচ্ছু না। আপাতদৃষ্টিতে দেখিলে মনে হইবে আমরা যেন ইঁহাদের গ্রাহ্যের মধ্যেই আনিতেছি না।

পারিপার্শ্বিক অবস্থা – সংক্ষেপে— নিম্নলিখিত প্রকার।

আমার বাসাবাটির ক্ষুদ্র প্রাঙ্গণে শ্রীহীন ক্যাম্পচেয়ারে অর্দ্ধমলিন লুঙ্গি পরিয়া শিথিলাঙ্গ আমি সম্মুখস্থ গড়গড়া হইতে অর্দ্ধনিমীলিত

নেত্রে ধূমপান করিতেছি। পাকশালার বারান্দায় আমার গৃহিণী যুগপৎ উবু এবং হেঁট হইয়া নির্ব্বাণোন্মুখ চুল্লিটিকে পুনরায় সঞ্জীবিত করিবার জন্য সাশ্রুনয়নে একটি দুর্দ্দশাগ্রস্ত তালবৃন্ত সবেগে সঞ্চালন করিতেছেন। বাড়ির ছেলেমেয়েরা ইতস্তত হুড়াহুড়ি করিতেছে। দ্বাদশ দিবস পরে এক মোট লইয়া শ্রীমতী রজকিনী দর্শন দিয়াছেন এবং এনায়েৎ খাঁকে আমল না দিয়া ভূতোর সহিত তর্কে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

এই পারিপার্শ্বিকের মধ্যে প্রফেসর এনায়েৎ খাঁর অঙ্গুলি-স্পর্শে সুরবাহারের উদারা মুদারা তারায় বাগেশ্রী রাগিণী কাঁদিয়া মরিতেছে।

মানবসুলভ ঔৎসুক্য থাকিলে যে কোন ব্যক্তির পক্ষেই এই প্রশ্নটি করা স্বাবাভিক—এতগুলি গুণী লোকের সম্মুখে আমি সপরিবারে এমনভাবে নিজমূর্ত্তি ধরিয়া রহিয়াছি কেন?

পাশের বাড়ির ক্ষেন্তপিসি আসিয়া হাজির হইলেও তো আমার গৃহিণী মাথার কাপড়টা টানিয়া মুখে হাসি ফুটাইয়া সশ্রদ্ধভাবে আসনখানা আগাইয়া দিয়া তটস্থ হইয়া দাঁড়াইয়া ওঠেন এবং আমিও প্রিয়বন্ধু প্রাণকান্তের সম্মুখেও এমন শ্লথ-মূর্ত্তি লইয়া প্রকাশ পাইতে লজ্জাবোধ করি। অথচ প্রফেসার এনায়েৎ খাঁর মত গুণীকে আমরা এটুকু খাতিরও দেখাইতেছি না—ইহার কারণ কি?

কারণ আছে বই কি—অত্যন্ত স্থূল কারণ।

প্রফেসার এনায়েৎ খাঁ সশরীরে উপস্থিত নাই। গ্রামোফোনে রেকর্ড বাজিতেছে।

সশরীরী ক্ষেন্তিপিসি অথবা প্রাণকান্ত শারীরিক দাবির জোরে

যেভাবে আমাদের নিকট হইতে খাতির আদায় করিতে পারেন—অশরীরী এনায়েৎ খাঁ বা রবীন্দ্রনাথ তাহা করিতে অক্ষম। এনায়েৎ খাঁ বা রবীন্দ্রনাথ যদি দয়া করিয়া এ দীনের কুটিরে পদার্পণ করিতেন তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমরা আহার-নিদ্রা বিস্মৃত হইয়া যথাসাধ্য তাঁহাদের অর্চ্চনা করিতাম এবং আচারে, ব্যবহারে, পরিচ্ছদাদিতে সৌষ্ঠব রক্ষা করিবার প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া মনে মনে নাস্তানাবুদ হইলেও বাহিরে হাসিমুখে থাকিতাম। কিন্তু রেকর্ডবিহারী অদেহী রবীন্দ্রনাথ, এনায়েৎ খাঁ, কৃষ্ণচন্দ্র দে বা আলাউদ্দিন খাঁকে লইয়া এতখানি বিব্রত হইতে আমরা অভ্যস্ত নহি, প্রস্তুতও নহি।

কল্পনা করিতেও ভয় হয়।

যেই রেকর্ডে রবীন্দ্রনাথ আবৃত্তি সুরু করিলেন অথবা এনায়েৎ খাঁ সুরবাহার ধরিলেন অমনই যদি আমাকে ছুটিয়া গিয়া চুলটা আঁচড়াইয়া, গায়ে সিল্কের পাঞ্জাবি এবং পায়ে পাম্পসু পরিয়া আসিয়া সস্মিতমুখে ঘূর্ণ্যমান রেকর্ডখানার দিকে তাকাইয়া শ্রদ্ধাভরে ঘাড় নাড়িতে হয় তাহা হইলেই তো গিয়াছি। ইহা করা অপেক্ষা রেকর্ডগুলি চুরমার করিয়া গ্রামোফোনটি পুড়াইয়া ফেলা ঢের কম অস্বস্তিজনক।

কিন্তু একথাও শতবার স্বীকার্য্য যে ক্ষেন্তিপিসি অথবা প্রাণকান্ত অপেক্ষা এই সকল গুণীগণকে আমরা অধিক শ্রদ্ধা করি এবং সৌভাগ্যক্রমে ইহাদের দৈহিক সান্নিধ্যলাভ করিতে পারিলে শ্রদ্ধাপ্রদর্শন করিবার জন্য আকুল হইয়া উঠি। অথচ যে গুণাবলীর জন্য আমরা ইঁহাদের প্রতি শ্রদ্ধাবান, মাত্র সেই গুণাবলী বাহ্যত আমাদের ততটা উদ্‌বুদ্ধ করে না। অর্থাৎ চিন্তা করিলে ইহাই দাঁড়াইতেছে যে সাকার শ্রদ্ধা প্রদর্শনের জন্য সাকার মূর্ত্তির প্রয়োজন।

নিরাকার গুণকে আমরা যে শ্রদ্ধা করিয়া থাকি তাহাও নিরাকার—তাহার বাহ্যিক কোন সাড়ম্বর প্রকাশ নাই।

দেখিতেছি ভগবান সম্বন্ধেও যাহা—এক্ষেত্রেও তাহাই।

একটা সাকার মূর্ত্তি—তাহা সে মৃণ্ময় প্রতিমাই হউক, ওঁ-ই হউক, ক্রসই হউক অথবা রক্তমাংসের মানবই হউক—মনের মতন একটা সাকার মূর্ত্তি পাইলেই আমরা ঢাক, ঢোল, কাঁসর, ঘণ্টা বাজাইয়া তাঁহাকে পূজা করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠি, না করিলে কেমন যেন তৃপ্তি হয় না। কিন্তু নিরাকার ব্রহ্মে নিমগ্ন হইয়া থাকিবার জন্যএসব কিছুরই প্রয়োজন নাই—তন্ময় হইয়া চক্ষু বুজিয়া থাকিলেই হইল।

সুতরাং চক্ষু বুজিয়াই নিরাকার এনায়েৎ-বাগেশ্রী-রসে নিমজ্জিত হইয়া গড়গড়ায় মৃদু মৃদু টান দিতেছিলাম, এমন সময় কড় কড় করিয়া বাহিরের দুয়ারের কড়াটা নড়িয়া উঠিল।

"ওরে ভূতো—দেখ তো—বাইরে কে এসেছে—"

ভূতো চলিয়া গেল।

সাড়ে তিন মিনিট শেষ হইয়াছিল, সুতরাং এনায়েৎ খাঁ বিদায় লইলেন। এইবার রবীন্দ্রনাথের পালা। কিন্তু রবীন্দ্রনাথকে একটু অপেক্ষা করিতে হইবে—দ্বারপ্রান্তে জনৈক সাকারের আবির্ভাব হইয়াছে। নিরাকারের অপেক্ষা সাকারের দাবী প্রবলতর।

ভূতনাথ ফিরিয়া আসিয়া আমার হাতে একটি পত্র দিল এবং বলিল, বাহিরে একটি বাবু দাঁড়াইয়া আছেন।

পত্রটি প্রিয়বন্ধু প্রাণকান্ত লিখিয়াছেন।

সংক্ষিপ্ত পত্র।—

"এই ভদ্রলোকটিকে তোমার বৈঠকখানায় বসাও। আমি একটু পরে আসিতেছি।"

ভূতোকে বলিলাম, "বাবুকে বৈঠকখানায় নিয়ে গিয়ে বসা।"

উঠিতে হইল। লুঙ্গি ছাড়িয়া একটি ফরসা কাপড় এবং জামাও পরিতে হইল।

বৈঠকখানায় গিয়া দেখিলাম সম্পূর্ণ অপরিচিত জনৈক ভদ্রলোক বসিয়া আছেন। কখনও দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না।

নমস্কার বিনিময়ের পর আসন গ্রহণ করিলাম। রবীন্দ্রনাথের জন্য মনটা ছটফট করিতেছিল।

ভদ্রলোকটিকে বলিলাম, "গ্রামোফোন বাজাচ্ছিলাম। শুনবেন গ্রামোফোন ?"

ভদ্রলোক শুধু একটু মুচকি হাসিলেন। বুঝিলাম, কোন আপত্তি নাই। ভূতোকে আদেশ করিলাম, "ওরে, গ্রামোফোন আর রেকর্ডগুলো এইখানেই নিয়ে আয়।

ভদ্রলোক হাসিমুখে চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন।

গ্রামোফোন আসিল।

রবীন্দ্রনাথের রেকর্ডখানা তাঁহার হাতে দিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "এইখানা দিই, কি বলেন ?"

তিনি উল্টাইয়া পাল্টাইয়া রেকর্ডখানা দেখিয়া সস্মিতমুখে সম্মতি-সূচক ঘাড় নাড়িলেন।

রবীন্দ্রনাথের আবৃত্তি সুরু হইল।

আবৃত্তি সুরু হইবামাত্র ভদ্রলোকের মুখের ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়া আমি বিস্মিত হইয়া গেলাম। এরূপ তন্ময়, তদ্গত, শ্রদ্ধাবিষ্ট মুখচ্ছবি ইতিপূর্ব্বে আমি দেখি নাই। এই রেকর্ড-খানি আমি এবং বন্ধুবান্ধবগণ সকলেই তো বহুবার শুনিয়াছি। কিন্তু এই ভদ্রলোকের

মুখে যে সুগভীর রস-চেতনা সুপরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে এমনটি তো আমাদের কাহারও হয় নাই।

বুঝিলাম, প্রকৃতই ভক্ত লোক। ভদ্রলোকের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হইলাম।

সাড়ে তিন মিনিট শেষ হইতেই রবীন্দ্রনাথ আবৃত্তি বন্ধ করিলেন।

ভদ্রলোকের দিকে চাহিয়া দেখিলাম, তিনি নিমীলিত নয়নে মুগ্ধমুখে বসিয়া আছেন, মনে হইল যেন বাহ্যজ্ঞানশূন্য।

রেকর্ডখানা আবার দিলাম।

ভদ্রলোক নিস্পন্দ হইয়া ঠিক সেইরূপ তন্ময়ভাবে ঠায় বসিয়া রহিলেন, যেন রস-সমুদ্রে তলাইয়া যাইতেছেন।

রবীন্দ্রনাথের আবৃত্তি অতিশয় উচ্চাঙ্গের, এ সম্বন্ধে আমাদের বিন্দুমাত্র সংশয় নাই। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের আবৃত্তি যে কোন লোককে এমনভাবে আবিষ্ট করিতে পারে, ইহা আমার ধারণাতীত ছিল। এরূপ ভক্ত লোক আমি এই প্রথম দেখিলাম।

আমিও রবীন্দ্রনাথের একজন ভক্ত। কিন্তু ইহার ভক্তির নিকট মনে মনে আমাকে হার মানিতে হইল।

আবার সাড়ে তিন মিনিট শেষ হইল।

ভদ্রলোক দেখিলাম ঠিক তেমনই বসিয়া আছেন,—স্তিমিতনয়ন, ভাবগদগদ।

তৃতীয়বার রেকর্ডটি দিব কি না ভাবিতেছিলাম, এমন সময় প্রাণকান্ত আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং বলিলেন, "ওসব এখন বন্ধ কর, কাজের কথা হোক আগে।"

বলিলাম, "আহা চটো কেন! ভদ্রলোক কেমন মুগ্ধ হয়ে শুনছেন দেখ দিকি!"

প্রাণকান্ত সাধারণত মুচকি হাসিয়া থাকেন। কিন্তু এ কথায় তিনি হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন !

"আরে ও শুনবে কি ! ও যে বদ্ধ কালা।"

স্তম্ভিত হইয়া গেলাম।

সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হইয়া যেন আর একটি সত্যের সম্মুখীন হইলাম। সত্যই ইনি অতি উচ্চস্তরের সাধক, নাম শুনিয়াই সমাধিস্থ হয়। মানসপটে কৌপীনধারী, সংসারবিরাগী, শ্রুত অশ্রুত বহু সন্ন্যাসীর মূর্ত্তি ভাসিয়া উঠিল, কেহ হিমালয়কন্দরে, কেহ নিবিড় অরণ্যে, কেহ শ্মশান-বক্ষে—নাম-মাত্র সম্বল করিয়া আনন্দ-সাগরে ভাসিতেছেন,—বাহ্যজ্ঞানহীন রুদ্ধ ইন্দ্রিয় ভূমাবিলাসী !

ইনিও সেই জাতের লোক।

হেঁট হইয়া পদধূলি লইতে যাইতেছিলাম, এমন সময় চমকিত হইয়া শুনিলাম প্রাণকান্ত বলিতেছেন, "ভদ্রলোকের একটি অবিবাহিতা ভগ্নী আছেন। তোমার নাতিটির সঙ্গে বিয়ে দেবে ? যদি দাও ভারি উপকার হয়। আমাকে এসে ভারি ধরেছেন এঁর মা—"

কিছুক্ষণ আমার মুখে কথা সরিল না। তাহার পর বলিলাম, "আচ্ছা, বেশ তো ! মেয়েটির কুষ্ঠিখানা একবার পাঠিয়ে দেবেন। কুষ্ঠির মিল হ'লে তারপর কথাবার্ত্তা হবে।"

দুই চারি কথার পর ভদ্রলোককে লইয়া প্রাণকান্ত চলিয়া গেলেন।

আমি নির্ব্বাক হইয়া ভাবিতে লাগিলাম—

"দুই এবং দুই যোগ করিয়া চার হইল। কিন্তু খুশি হইলাম না তো ! লোকটাকে ভক্ত ভাবিয়া সুখী হইয়াছিলাম, ভণ্ড ভাবিয়া

কষ্ট পাইতেছি। বুদ্ধির যে বিশ্লেষণী শক্তির সূক্ষ্মবিচারে নৈপুণ্যে ভক্ত ভণ্ডে রূপান্তরিত হইয়া গেল, সেই শক্তি লইয়া আমি করিব কি? এই শক্তি যদি না ক্রমশ লোপ পায় তাহা হইলে তো দেখিতেছি আনন্দলোক হইতে নির্ব্বাসন অবশ্যম্ভাবী। এত বুদ্ধি লইয়া করিব কি!"

"দাদু।"

দেখিলাম ছোট নাতিনীটি আসিয়াছেন।

"কি দিদি?"

"আমাদের খেলাঘরে আজ তোমার নেমন্তন্ন। খাবে চল।"

গেলাম। দেখিলাম, ধূলার পোলাও, কাঁকরের ডালনা, খোলাম-কুচির কাবাব, কাদার মোহনভোগ সাজাইয়া শিশুর দল মহা আনন্দে আত্মহারা হইয়া পড়িয়াছে।

বিশ্লেষণী শক্তিকে শিকায় তুলিয়া রাখিয়া কচুপাতার আসনে সানন্দে বসিয়া পড়িলাম।

গৃহিণী আসিয়া বলিলেন, "তোমার ভীমরতি ধরল নাকি? গ্রামোফোনটা বাইরে ফেলে এলে, দুয়ার খোলা হাঁ-হাঁ করছে—"

হাসিয়া বলিলাম, "ভীমরতি কবে সত্যি ধরবে বলতে পার?"

চিন্তার কথা

চিন্তা করিতেছিলাম।

বিনাব্যয়ে যুগপৎ সুখ ও দুঃখ ভোগ করিবার এমন সহজ উপায় আর নাই। অবশ্য চিন্তাটা পরকীয়া, অর্থাৎ পরের বিষয়ে হওয়া প্রয়োজন। নিজস্ব দৈনন্দিন চিন্তা নিজস্ব স্ত্রীর মতই মোহমুক্ত। তাহাতে কোন উত্তেজনা নাই। কিন্তু নিজেকে বাদ দিয়া বিরাট বিশ্বে আপনার দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া একটু চিন্তা করুন, দেখিবেন আরাম পাইবেন। বিশেষত যদি চিন্তাটি দুশ্চিন্তা হয়। ধরা যাউক আপনি সুখী লোক। আপনার চতুর্দ্দিকে সুখ উথলিয়া উঠিতেছে, দুঃখের কোন কারণ নাই। কিন্তু এ জাতীয় একটি দুশ্চিন্তার শরণাপন্ন হউন, দেখিবেন বিচিত্র একটি অনুভূতি মনের মধ্যে আলো-ছায়ার অপূর্ব্ব মায়ালোক সৃজন করিতেছে।

ধরুন, "বাঙালী জাতির ভবিষ্যৎ গতি কি হইবে"—তামাক টানিতে টানিতে এই নৈর্ব্যক্তিক চিন্তাটাই যদি করিতে থাকেন অবিলম্বে আপনার দশদিকে অন্ধকার নামিতে থাকিবে। কিন্তু মজা এই, সেই অন্ধকারের সূচীভেদ্যতা যতই নিদারুণ হইয়া উঠিবে, অর্থাৎ যতটা ভয়াবহরূপে আপনি তাহা মানসপটে ফুটাইয়া তুলিতে সক্ষম হইবেন, তাম্রকূটধূমাচ্ছন্ন দুশ্চিন্তাগ্রস্থ আপনার অন্তর ততই এক বিচিত্র রসে আপ্লুত হইতে থাকিবে। সহৃদয় ব্যক্তির নিকট সে রস মিষ্ট নহে, তাহা বলাই বাহুল্য। রোষ ক্ষোভ হতাশা প্রভৃতির সংমিশ্রণে তাহা নিতান্তই তিক্ত। কিন্তু এই তিক্ততারই মাদকতা-শক্তি আছে। তিক্ত সুরার ন্যায় ইহা আপনাকে ক্রমশ উত্তেজিত

করিতে থাকিবে, এবং এই শোচনীয় দুঃখময় চিন্তাতেও আপনি উত্তেজনাজনিত একপ্রকার সুখ-ভোগ করিতে থাকিবেন। এমন কি সমস্ত জিনিসটাকে সম্যকরূপে পর্য্যালোচনা করিবার জন্য বারম্বার কলিকা-বদলানো আপনার প্রয়োজন হইয়া পড়িবে।

আবার ধরা যাউক, আপনি সুখী নহেন—দুঃখী। দুঃখের আপনার অন্ত নাই। অর্থ নাই, শক্তি নাই, অথচ বেকার পুত্র, অবিবাহিতা কন্যা, রুগ্না স্ত্রী সম্বলিত বৃহৎ পরিবার। নানারূপ অভাব-অভিযোগের তাড়নায় আপনাকে অহরহ বিব্রত করিয়া তুলিয়াছে, কি করিবেন ভাবিয়া পাইতেছেন না। এই কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় অবস্থাতেও যদি আপনি একটু সময় করিয়া "বাঙালী জাতির ভবিষ্যৎ কি হইবে"—এই বিষয়ে একটু চিন্তা করিতে পারেন, দেখিবেন মনের ভার অনেকটা লঘু হইয়া যাইবে। অন্তরে অননুভূতপূর্ব্ব আনন্দলাভ করিবেন। গভর্মেণ্ট, কংগ্রেস, বর্ত্তমান শিক্ষাপদ্ধতি, মন্ত্রীবর্গ এবং সর্ব্বশেষে নিজের অদৃষ্টকে দায়ি করিয়া সত্যই আপনি আরাম পাইবেন। নিজেকে সপ্তরথী-পরিবেষ্টিত যুযুধান অভিমন্যু বলিয়া মনে হইবে, এবং অন্যায় সমরে বিধ্বস্ত হইয়াও বড় বড় বীরপুরুষগণ যে সহানুভূতিময় গৌরব লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছেন, আপনিও নিজেকে সেই জাতীয় গৌরবের ন্যায্য অধিকারী মনে করিয়া কথঞ্চিৎ আত্মপ্রসাদ লাভ করিবেন। এতদ্ব্যতীত এই সূত্রে পরিচিত অধিকতর দুঃখী অন্যান্য বাঙালীগণের অবস্থার সহিত নিজের অবস্থার তুলনামূলক সমালোচনা করিয়া এবং ভবিষ্যতে বাঙালীসন্তানগণ কিরূপে একমুঠা অন্নের জন্য দ্বারে দ্বারে হাহাকার করিয়া বেড়াইবে, তাহা কল্পনা করিয়া আপনার স্বকীয় দুঃখটা অকিঞ্চিৎকর বোধ হইবে। আপনি সান্ত্বনা পাইবেন, এবং হয়তো ভগবানকে ধন্যবাদও দিবেন।

সুতরাং চিন্তা করা প্রয়োজন।

এই জাতীয় চিন্তা আপনাকে পারিপার্শ্বিক 'পরিস্থিতি'র কথা ভুলাইয়া দেয়, উপরন্তু অপূর্ব্ব আনন্দরসে নিমজ্জিত করে। কেবল বাঙালী জাতির ভবিষ্যৎ-বিষয়ক চিন্তাই নয়, যে কোন চিন্তাই এ বিষয়ে সমান ফলপ্রসূ। 'ভগবৎ চিন্তা' 'ইলেক্‌শন চিন্তা' পাটের ভবিষ্যৎ চিন্তা' হিন্দু-মুসলমান চিন্তা'—ইহার যে কোন একটা ধরুন. এবং খানিকক্ষণ নিবিষ্টভাবে তন্ময় হইয়া থাকুন, দেখিবেন সুরাপান না করিয়াও আপনার কান গরম হইয়া উঠিয়াছে, এবং রগের শিরাসমূহ দপদপ করিতেছে।

আমি যে চিন্তাটি করিতেছিলাম, তাহার বিষয়—বাঙালী জাতির ভবিষ্যৎ নয়, দুর্গাপ্রতিমার ভবিষ্যৎ। সামনেই পূজা, সুতরাং চিন্তাটা জগজ্জননীকে কেন্দ্র করিয়াই সুরু হইয়া গিয়াছিল।

চিন্তাটির সূত্রপাত করিয়াছিলেন আমার গৃহিণী।

অকস্মাৎ লক্ষ্য করিলাম, আমার বৃদ্ধা সেকেলে গৃহিণী স্কার্টপাড় শাড়ি ও আধুনিক ধরণের ব্লাউজ পরিধান করিয়াছেন। বিস্মিত হইলাম।

তাহার পর মনে হইল যুগ বদলাইবে না কেন। নিজেকে দিয়াই তো বুঝিতে পারিতেছি। পূর্ব্বে খড়ম পরিতাম, এখন স্যাণ্ডাল পরিতেছি। সেকালে আমরা গোঁফ রাখাটা পছন্দ করিতাম এবং গোঁফের ডগাটা কি ভাবে রাখিলে মানানসই হইবে তাহার চিন্তায় সারা হইতাম। এ কালে যুবকেরা গোঁফ কামাইয়া ফেলিয়া, অথবা গোঁফের ডগাদুইটাকে নিশ্চিহ্ন করিয়া আরাম পাইতেছে।

রুচি বদলাইয়াছে, সে বিষয় সন্দেহ নাই। বদলানো উচিতও। এই চিন্তার সূত্র ধরিয়াই দুর্গাপ্রতিমার ভবিষ্যৎ রূপ সম্বন্ধে চিন্তিত

হইয়াছিলাম। আশ্চর্য্য হইয়া ভাবিতেছিলাম সবই তো বদলাইতেছে, প্রতিমার রূপটা তো কই বদলাইতেছে না! সেই সাবেক দশভূজা মূর্ত্তি!

শক্তি-পূজা অবশ্য মানুষ চিরকাল করিবে। কিন্তু তাই বলিয়া শক্তির প্রতীক যে প্রতিমা, তাহার রূপ যে চিরকাল একই থাকিবে এমন কোন কথা নাই। কস্তাপাড় যদি স্কার্টপাড় হইতে পারে, স্যাণ্ডাল যদি খড়মের স্থান গ্রহণ করিতে পারে, কেরোসিনের ডিব্‌রি যদি টর্চে রূপান্তরিত হয়, দুর্গাপ্রতিমা বদলাইবে না কেন?

অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া পুনরায় তামাক হুকুম করিলাম।

মনে হইতে লাগিল, এই প্রগতির যুগে সেকেলে ধরণের একটা একঘেয়ে প্রতিমা লইয়া পূজা করাটা নিতান্তই অক্ষমতার পরিচয়। দুই এক স্থানে শুনিয়াছি নাকি মূর্ত্তির ঢং বদলাইয়াছে, ওরিয়েণ্টাল রীতিতে গঠিত মূর্ত্তি আমদানি হইয়াছে। কিন্তু আমার মনে হইতে লাগিল, ইহা প্রগতির যথেষ্ট পরিচয় নয়। এই বৈজ্ঞানিক যুগে শক্তি-পূজার প্রতীক একটা মামুলি মাটির পুতুল, এই কথা স্মরণ-মাত্রেই মনে জুগুপ্সার সঞ্চার হইতে লাগিল। আধুনিকা শক্তি-প্রতিমা কিরূপ হওয়া উচিত, কল্পনা করিতে লাগিলাম।

মানসপটে নিম্নবর্ণিত ছবি ফুটিতে লাগিল। মা-দুর্গা রীতিমত এরোপ্লেন-বিহারিণী-বেশে মিলিটারি কায়দায় গগ্‌ল পরিধান করিয়া এরোপ্লেন হইতে সামরিক-জাহাজ-রূপ অসুরের উপর বোমা নিক্ষেপ করিতেছেন। নিম্নে টর্পেডো-রূপী সিংহ অতি আধুনিক কৌশলে জাহাজটিকে আক্রমণ করিতেছে। সেনাপতি কার্ত্তিকেয় খাকি হাফ্‌প্যাণ্ট হাফ্‌শার্ট পরিধান করিয়াছেন, বামহস্তে ধূমায়িত পাইপ, গোঁফ মিলিটারি কায়দায় ছাঁটা। ময়ূরের পরিবর্ত্তে মিলিটারি-

সরঞ্জাম-সমন্বিত ভীষণদর্শন মোটরকার। লক্ষ্মী সরস্বতীর মেয়েলি মূর্ত্তি নাই। লক্ষ্মীর স্থানে একটি প্রকাণ্ড ফ্যাক্টরির এবং সরস্বতীর স্থানে একটি প্রকাণ্ড লাইব্রেরির কংক্রিট মিনিয়েচার বিল্ডিং। গণেশ নাই। কেবল গণেশের শুঁড়টি আছে. এবং তাহাও একটি জিজ্ঞাসা-চিহ্ন-মূর্ত্তি [?] পরিগ্রহ করিয়াছে। সেই জিজ্ঞাসা-চিহ্ন-মূর্ত্তির নীচে একস্থানে কতকগুলি টাকা, একস্থানে একটা মস্তিষ্কের প্রতিমূর্ত্তি এবং আর একস্থানে কতকগুলি রেকমেণ্ডেশন লেটার ইতস্তত বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। ইহার মর্ম্ম আধুনিক জগতে সিদ্ধিদাতা কি ?—অর্থ ? মস্তিষ্ক ? সুপারিশ ? কেহ সঠিক কিছু বলিতে পারে না। সুপারিশ-পত্রগুলির নিকট একটি মূষিক ঘুরঘুর করিতেছে। ওগুলি যদি সিদ্ধির সন্ধান না দিতে পারে মূষিকটি ওগুলিকে উদরসাৎ করিবে। অর্থ ও মস্তিষ্কও সিদ্ধিদানে অকৃতকার্য্য হইলে তাহাদিগকে কলা দেখাইবার জন্য কলাগাছটি মজুত আছে।

সিদ্ধিদাতার সংশয়-অঙ্কুশ-মূর্ত্তি।

অকস্মাৎ কল্পনা-স্রোত ব্যাহত হইল।

তবলা ও হার্ম্মোনিয়ম বাজাইতে বাজাইতে একদল ছোকরা আসিয়া উপস্থিত।

ব্যাপার কি ? কি চাই ?

তাহারা সঙ্গীত দ্বারাই মনোভাব প্রকাশ করিতে লাগিল। হৃদয়ঙ্গম করিলাম জাপান-বিধ্বস্ত চীনদেশের দুঃখে তাহারা বিগলিত এবং তাহাই সুর-লয়-তাল-সংযোগে প্রকাশ করিতেছে।

অবশেষে একটি কথা তাহারা নীরস গদ্যে নিবেদন করিল, চাঁদা চাই।

কিসের চাঁদা ?

চীনাদের জন্য জগজ্জননী দুর্গার কৃপা আকর্ষণ করিতে হইবে, এবং তজ্জন্য স্পেশাল চণ্ডীপাঠ ও স্পেশাল অঞ্জলি দিবার ব্যবস্থা করা হইতেছে। কিছু অর্থ পাইলে পুরোহিত মহাশয় তাহা সুসম্পন্ন করিয়া দিবেন বলিয়া আশ্বাস দিয়াছেন।

কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিলাম।

চাঁদা লইয়া যুবকবৃন্দ চলিয়া গেলে পুনরায় দুর্গাপ্রতিমার আধুনিক রূপ বিষয়ে চিন্তা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। কিন্তু দেখিলাম, মন আর তেমন উৎসাহভরে সাড়া দিতেছে না। পীড়াপীড়ি করাতে হাসিয়া বলিল, দেখ, ইহা লইয়া বৃথা কেন মাথা ঘামাইয়া মরিতেছ? আমাদের যতই না কেন প্রগতি হউক, এখনও বেশ কিছুদিন মাটি ও খড় দিয়াই এ দেশে পুতুলরূপে শক্তি-প্রতিমা নির্ম্মিত হইবে।

মনের এতাদৃশ চিন্তা-পরাঙ্মুখতা দেখিয়া বুঝিলাম, আর একবার তামাক খাওয়া প্রয়োজন। তামাক খাইলেই মন বোধ হয় আবার সক্রিয় হইয়া উঠিবে এবং চিন্তা করিতে থাকিবে।

সুতরাং ভুতোকে হাঁক দিলাম।

প্রাণকান্ত

আমার বিশ্বাস প্রাণকান্ত ভুল করিতেছে।

গণেশ পপুলার লোক। জনপ্রিয় হইতে হইলে যে সকল গুণাবলী থাকা নিতান্তই প্রয়োজন গণেশের সে সকল আছে। সংক্ষেপে, সে মিথ্যাবাদী, মিষ্টভাষী এবং প্রয়োজনীয়। অনর্গল মিথ্যাভাষণ সত্ত্বেও তাহার মিষ্টবচনে আমরা বিগলিত হইয়া যাই এবং নিজেদের প্রয়োজনের খাতিরে তাহাকে ত্যাগ করিতে পারি না। গণেশের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিলে প্রাণকান্তের পরাজয় অনিবার্য্য।

জনপ্রিয় বলিয়া গণেশ যে অজাতশত্রু এমন কথা বলিতেছি না। জনপ্রিয় বলিয়াই তাহার শত্রু আছে। কিন্তু এই সকল শত্রু এখনও পরোক্ষচারী। প্রকাশ্যত গণেশের বিরুদ্ধাচরণ করিবার মত শক্তি-সংগ্রহ এখনও তাহারা করিতে পারে নাই। মনে মনে তাহারা গণেশ-চরিত্রের ছোট বড় নানা দোষের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার করে এবং সুযোগসুবিধামত সেগুলিতে নানা রঙ ফলাইয়া আড়ালে ফলাও করিয়াও থাকে কিন্তু প্রকাশ্যে তাহারা প্রাণকান্তের সহযোগিতা করিবে এমন আশা করি না। মাঝে মাঝে গণেশের কথা ভাবিয়া মর্ম্মাহত হই। লোকটা পপুলার বলিয়াই বোধ হয় তাহার অন্তরঙ্গ বন্ধু খুব কম। সকলেই স্বার্থের খাতিরে তাহার সহিত লৌকিক ভদ্রতা রক্ষা করে, মৌখিক বিনয় প্রকাশ; কিন্তু মনে মনে অধিকাংশ লোকই তাহার উপর অপ্রসন্ন। হিতৈষী বন্ধুর মত দোষ দর্শাইয়া দুই চারিটা কথা শুনাইয়া দিবে এমন লোক গণেশের জীবনে নাই বলিলেই চলে। সকলেই তাহাকে খাতির করে, ভোট দেয়, কিন্তু

ভালবাসে না। কাগজে কলমে সে জনপ্রিয়, কিন্তু কাহারও অন্তরলোকে তাহার স্থান নাই।

শুধু গণেশ নয়, পৃথিবীসুদ্ধ পপুলার লোকের এই দুর্দ্দশা। নিখুঁত মানুষ কখনও পপুলার হইতে পারে না। চরিত্রে, শিক্ষায়, দীক্ষায় রীতিমত ভেজাল না থাকিলে পপুলার হওয়া শক্ত। খাঁটি সোনা দৈনন্দিন ব্যবহারের পক্ষে অচল, স-খাদ গিনি-সোনারই বাজারে সমধিক প্রচলন। প্রচলন বটে, কিন্তু খাদের সম্বন্ধে আমরা উদাসীন থাকি না। রীতিমত কষিয়া আমরা তাহার পরিমাণ নির্দ্ধারণ করি এবং খাঁটি সোনার সহিত তুলনামূলক সমালোচনা করিয়া অ-খাঁটি সোনাকে হীনতর স্থান দিয়া থাকি। তেমনই স-খুঁত চরিত্র লইয়া এবং স-খুঁত চরিত্রের জোরেই কোনক্রমে যেই একটি মানুষ পপুলার হইয়া উঠেন অমনই তাঁহার চারিত্রিক খুঁতগুলিও লোকচক্ষে স্পষ্টতররূপে প্রতীয়মান হইয়া নিন্দার ন্যায্য খোরাক যোগাইতে থাকে। পপুলারিটি-গগনে ক্রমে ক্রমে মেঘ-সঞ্চার হয় এবং অকস্মাৎ হয়তো ঝঞ্ঝাবৃষ্টির সূচনাও করে।

সুতরাং বিশ্লেষণ করিলে ইহাই দেখা যাইতেছে যে, নির্দ্দোষ লোক পপুলার হয় না, এবং পপুলার হইবার পরই তাহার দোষগুলিও পপুলার হইয়া পড়ে।

চন্দ্র পপুলার, তাহার কলঙ্কটাও পপুলার।

সূর্য্য পপুলার, তাহার স্পটগুলিও ক্রমশ পপুলার হইয়া উঠিতেছে।

সুতরাং পপুলারিটিকামী ব্যক্তিমাত্রেরই প্রণিধান করিয়া দেখা কর্ত্তব্য যে, যে সকল চারিত্রিক ত্রুটিকে মূলধন করিয়া তিনি জনসমাজে আধিপত্য বিস্তারের আশা করিতেছেন এই সকল ত্রুটিগুলি পরে

যদি ঘরে ঘরে আলোচিত হইতে থাকে তাহা হইলে তিনি তাহা নির্ব্বিকার-চিত্তে সহ্য করিতে পারগ কি না।

যদি অপারগ হন তাহা হইলে তাঁহার ও-পথ ত্যাগ করাই উচিত।

প্রাণকান্ত ভোট-যুদ্ধে গণেশের সহিত পারিবে কি না তাহা আলোচনা করাও এক্ষেত্রে আমি অপ্রাসঙ্গিক মনে করিতেছি। কারণ প্রিয়বন্ধু প্রাণকান্তকে যতদূর জানি তাহাতে পপুলারিটি-মার্গে স্বচ্ছন্দে চলিবার মত চলিষ্ণুতাই তাহার নাই।

সে সমালোচনা-অসহিষ্ণু। প্রায়ই সত্য কথা বলে। তাহার মনের কথার এবং মুখের কথার অসঙ্গতি খুব বেশি লক্ষ্য করিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না। ধর্ম্মানুমোদিত বিবেকবাঞ্ছিত পথে চলিবার দিকেই তাহার ঝোঁক বেশি। এরূপ লোক ভোট সংগ্রহ করিতে পারিলেই যে পপুলার নেতা হইয়া উঠিবে এমন আশা দুরাশা। কুব্জপৃষ্ঠ উষ্ট্রের পক্ষে সূচের ছিদ্রপথ দিয়া ন্যুব্জ দেহটা পার করিয়া লওয়া সম্ভব হইলেও হইতে পারে, কিন্তু প্রাণকান্তের পক্ষে পপুলার নেতা হওয়া অসম্ভব।

সুতরাং তাহাকে ওপথে যাইতেই দিব না।

আমি গণেশকেই ভোট দিব। বন্ধু বলিয়াই প্রাণকান্তকে এ বিপদ হইতে রক্ষা করা আমার কর্ত্তব্য। আগামী উনিশে তারিখে পোলিং। মাঝে আর তিনটা দিন বাকি। পোলিং-স্টেশনও আবার ভিন্ন গ্রামে। গাড়ীটা বলিয়া রাখিতে হইবে। গণেশকে ভোটটা দিয়া আসিব এবং চেষ্টা করিব যাহাতে আরও সকলে গণেশকেই ভোট দেয়।

প্রাণকান্ত কোনকালে নেতা হইতে পারিবে না। মাঝ হইতে

আমার সান্ধ্য আড্ডাটা মাটি হইয়া যাইবে। সুতরাং তাহাকে ভোট দিব না।

স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইয়া বসিয়া আছি।

প্রাণকান্ত আসিয়া প্রবেশ করিল।

দুই চারি কথার পর আমার মনোভাব প্রাণকান্তের নিকট ব্যক্ত করিলাম এবং আমার যুক্তির সারবত্তা তাহার নিকট প্রাঞ্জলভাবে বিবৃত করিতে চেষ্টা পাইলাম। আদ্যোপান্ত সমস্ত শুনিয়া প্রাণকান্ত বলিল, ডাক্তার দেখাও।

মানে?

মানে আমার ভোটের জন্য ভাবিতেছি না। কিন্তু তোমার বক্তৃতায় স্বাস্থ্যহানির আভাস পাইতেছি। সম্ভবত মস্তিষ্কটাই বিগড়াইয়াছে। অবিলম্বে ডাক্তার দেখাও।

বলিলাম, যতই না কেন রসিকতা কর, ভোট আমি তোমায় দিব না।

তাহাতে বিন্দুমাত্র ক্ষতি নাই, কিন্তু নিজের চিকিৎসা করাও। তোমার যখন এই বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে আমরা যুক্তি অনুযায়ী সমস্ত কার্য্য করি, তখন তোমার মানসিক স্বাস্থ্য সম্বন্ধে আমার ঘোরতর আশঙ্কা হইতেছে।

অর্থাৎ তুমি কি বলিতে চাও যে কোন কার্য্যই আমবা যুক্তি অনুযায়ী করি না?

আমরা সকল কার্য্যই খুশি অনুযায়ী করি এবং সংস্কারমুগ্ধ স্বকীয় বিবেকের নিকট এবং আর পাঁচজনের নিকট সাফাই গাহিবার জন্য পরে একটা যুক্তি খাড়া করি…বিচারালয়ে বিচারপতি ও জুরির নিকট সাফাই গাহিবার জন্য উকিল খাড়া করার মত।

বুঝিতে পারিলাম না।

অগ্রে ভৃত্যকে ডাকিয়া চা ও তামাকু দিতে বল। মনে হইতেছে অনেকক্ষণ ধূমপান কর নাই।

ভৃত্যেকে হাঁক দিলাম। যথা সময়ে চা ও তামাক আসিল। উভয়ে নীরবেই চা ও ধূমপান করিলাম।

নীরবতা ভঙ্গ করিয়া প্রাণকান্ত আবার বলিল, চিন্তা করিয়া দেখ দেখি, জীবনে যে সকল কার্য্য করিয়া প্রকৃত আনন্দলাভ করিয়াছ সেগুলির প্রেরণা কে জোগাইয়াছে? যুক্তি, না খুশি? হ্যাঁ, ভাল কথা, তোমার গৃহিণীর দুলজোড়া স্যাকরা দিয়া গিয়াছে, এই নাও।

দুলের বাক্সটি লইয়া টেবিলে রাখিলাম।

কয়েকদিন পূর্ব্বে প্রাণকান্তের গৃহিণীর নূতন কর্ণভূষণদ্বয় আমার গৃহিণীকেও স্বকর্ণ অনুরূপভাবে অলঙ্কৃত করিতে প্রবুদ্ধ করে। প্রবুদ্ধ গৃহিণীর বাসনা-পূরণার্থে প্রিয়বন্ধু প্রাণকান্তের শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া আমার গত্যন্তর ছিল না। কারণ যে আদর্শ আমার গৃহিণীকে অনুপ্রাণিত করিয়াছে সে আদর্শ প্রাণকান্তের স্ত্রীর কর্ণেই দোদুল্যমান। সুতরাং প্রাণকান্তকেই গহনাটি গড়াইবার ভার দিয়াছিলাম।

এই সামান্য ঘটনাটিই এখন অসামান্যতা লাভ করিল। প্রাণকান্ত বলিতে লাগিল, স্ত্রীকে অলঙ্কার গড়াইয়া দিবার স্বপক্ষে তোমার কি যুক্তি আছে বলিতে পার? স্ত্রীলোক অলঙ্কার পরিধান করে পুরুষের মনোহরণ করিবার জন্য। আশা করি, তোমার স্ত্রীর সজ্ঞানভাবে অন্য পুরুষের প্রতি লক্ষ্য নাই। ধরিয়া লইতেছি, তুমিই তাঁহার লক্ষ্যস্থল। তোমার মনোহরণ করার জন্য তোমার স্ত্রীর কি আর অলঙ্কার পরার প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে কর? প্রয়োজন

থাকিলেও সে অলঙ্কার তোমাকেই জোগাইতে হইবে, এতদপেক্ষা অধিক হাস্যকর ব্যাপার আর কি হইতে পারে? ইহার সরল অর্থ কি ইহাই দাঁড়ায় না—গাঁটের পয়সা খরচ করিয়া মনোহরণ করিবার জন্য সাজ-সরঞ্জামাদি সব আনিয়া দিলাম, মন উন্মুক্ত করিয়া বসিলাম, এইবার নাও, আমার মনটি হরণ কর। যেন বঁড়শিবিদ্ধ শফরী ছিপধারী মৎস্য-শিকারীকে সটোপ আর একটি বঁড়শি কিনিয়া দিয়া বলিতেছে, এইটিও বাগাইয়া একবার ফেল তো বাপু, গিলিয়া ধন্য হই।

প্রাণকান্ত ক্ষেপিলে প্রাণান্তকর ব্যাপার ঘটে।

ক্ষিপ্ত প্রাণকান্তের সহিত তর্ক করা অপেক্ষা তাহাকে একটা ভোট দেওয়া ঢের সহজ। সুতরাং বলিলাম, যাক, আর কথা বাড়াইয়া দরকার নাই, ভোট তোমাকেই দিব।

তোমার সুমতি দেখিয়া সুখী হইলাম, কিন্তু ভোটিং শেষ হইয়া গিয়াছে, তোমাকে আর কষ্ট করিতে হইবে না।

সে কি! পোলিং শুনিয়াছিলাম ঊনিশে, আজ তো মাত্র পনরই!

তুমি বাঙলা তারিখ বলিতেছ, পোলিং হইয়া গিয়াছে গত ইংরেজী মাসের ঊনিশে।

আকাশ হইতে পড়িলাম!

ফলাফল কি হইল?

হারিয়াছি, এক ভোটের জন্য।

আমার কাছে একটা লোক পাঠাইলেই পারিতে।

আমি কাহারও কাছে লোক পাঠাই নাই। ভোটে হারিয়াছি বটে, কিন্তু বাজি জিতিয়াছি। হরেনের সহিত বাজি রাখিয়া আমি

ভোট-যুদ্ধে নামিয়াছিলাম। হরেন বলিয়াছিল, আমি জিতিবই; আমি বলিয়াছিলাম, হারিবই। তোমার স্মরণ থাকিতে পারে, হরেনই আমার হইয়া ক্যান্‌ভাসিং করিয়াছে, আমি কিছুই করি নাই। যখন পোলিং হইতেছিল তখন আমি চকদিঘিতে মাছ ধরিতেছিলাম। সেই বাজির টাকা দিয়াই তোমার গৃহিণীকে দুল জোড়া গড়াইয়া দিলাম। তোমাকে ইহার মূল্য দিতে হইবে না। এখন দেখ দুলজোড়া শ্রীমতীর পছন্দ হইবে কি না।

খুলিয়া দেখিলাম। অপরূপ!

আবার আকাশে ফিরিয়া গেলাম।

শিশু

শিশুকে এত ভাল লাগে কেন?

আমার নবাগত দৌহিত্রটি সম্প্রতি আমার মনে এই চিন্তাটি উদ্রিক্ত করিয়াছে। পাঁচ বৎসরের শিশু, কিন্তু তাহাকে লইয়াই সমস্ত দিন মাতিয়া আছি; অন্য কিছু করিবার আর অবসর নাই। কখনও তাহাকে কাগজের নৌকা বানাইয়া দিতেছি, কখনও জাহাজ, কখনও দোয়াত, কখনও ঘুড়ি। শুধু তাই নয়, তাহাকে আমার গৃহিণীর কল্পিত প্রণয়ী ধরিয়া লইয়া তাহার সহিত নানারূপ ছদ্ম-কলহে প্রবৃত্ত হইয়াছি। বালকটি শিষ্ট নহে, শান্ত তো নহেই।

ইতিমধ্যেই সে আমার হুঁকা উল্টাইয়াছে, কলিকা ভাঙিয়াছে, চশমার খাপটি বারম্বার খুলিয়া চশমাটি অধিকার করিতে চাহিতেছে। ধূলিধূসরিত দেহ লইয়া ক্রমাগত আমার ঘাড়ে পিঠে পড়িতেছে। বালাপোষখানার দফা রফা হইয়া গেল।

তথাপি কিছুতেই তাহার উপর চটিতে পারিতেছি না। মাঝে মাঝে দুই একবার ধমক দিতেছি বটে, কিন্তু সে ধমকের অন্তঃসার-শূন্যতা অবিলম্বেই প্রকট হইয়া পড়িতেছে। দুষ্টটা হাসিতেছে।

সঙ্গে সঙ্গে আমিও হাসিতেছি।

খবরের কাগজটা আসিবামাত্রই সে দখল করিয়াছে, খানিকটা ছিঁড়িয়াছে এবং খবরের কাগজের প্রত্যেক ছবিটির বিষয়ে প্রাসঙ্গিক অপ্রাসঙ্গিক নানা প্রশ্নে বিব্রত করিয়া তুলিয়াছে। তাহাকে যাহা হউক একটা উত্তর দিয়া স্তোক দিতেছি বটে, কিন্তু নিজের অজ্ঞতায়

ও অক্ষমতায় মনে মনে লজ্জিত হইতেছি। ভুক্তভোগীমাত্রেই জানেন, সরল শিশুর সরল প্রশ্নগুলি কি ভীষণ সরল।

দাদু, খবরের কাগজে কি লেখা থাকে?

খবর।

খবর কি?

ইহার উত্তর দেওয়া কঠিন হইল। সুতরাং বলিলাম, নানা দেশের সব গল্প লেখা আছে ওতে, দাও রেখে দিই, নষ্ট করতে নেই।

গল্প বল না দাদু, একটা ওর থেকে! দেখ দেখ, ওটা কি দেখ!

দেখিলাম একটা টিকটিকি একটা পতঙ্গকে ধরিয়াছে।

মুমূর্ষু পতঙ্গটা ছটফট করিতেছে।

উত্তেজিত বালক খবরের কাগজ ফেলিয়া বালিশটার উপর দাঁড়াইয়া উঠিল।

বলিলাম, টিকটিকি ফড়িং ধ'রে খাচ্ছে।

বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে শিশু কিছুক্ষণ সেইদিকে তাকাইয়া রহিল। তাহার পর বলিল, টিকটিকি দুধ খায় না বুঝি?

না।

ভাত?

না। ভাত কে রেঁধে দেবে বল ওকে?

ওর বুঝি মা নেই?

বিপদ আসন্ন বুঝিয়া কৌশলে বিষয়ান্তরে উপনীত হইলাম। বালিশ থেকে নেমে দাঁড়াও, তোমার মা দেখতে পেলে বকবে।

বালিশে দাঁড়ালে মা বকে কেন দাদু, তুমি তো বক না?

এই উক্তির পর বালিশ 'পদদলিত করার জন্য তিরস্কারবাণী উচ্চারণ করা আমার পক্ষে অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইল। তাহার

জননীর অযৌক্তিক ক্রোধের দোহাই দিয়াই বালিশটি রক্ষা করিতে প্রয়াস পাইলাম।

তোমার মা যে ভয়ঙ্কর রাগী। দেখতে পেলে তোমাকেও বকবে, আমাকেও বকবে। বালিশ থেকে নাব।

মা তো এখন রান্নাঘরে।—এই বলিয়া দুর্ব্বৃত্তটা একটি পদ বালিশে রাখিয়া অন্য পদটি টেবিলে স্থাপন করিল। উদ্দেশ্য—টিকটিকিকে পর্য্যবেক্ষণ করা।

বুঝিলাম টেবিলস্থিত দোয়াতের অবস্থা আশঙ্কাজনক। কালি তো পড়িবেই, দোয়াতটাও না ভাঙে।

সুতরাং ভ্রমরবেশী রাজপুত্রের গল্প ফাঁদিয়া তাহার মনোযোগ আকর্ষণ করিতে চেষ্টা পাইলাম।

এইভাবে সমস্ত দিন চলিতেছে।

কিছুতেই ছোকরাকে বাগাইতে পারিতেছি না এবং পারিতেছি না বলিয়া মনে কোন প্রকার ক্ষোভও হইতেছে না। উপরন্তু খুশিই হইতেছি।

কিন্তু, কেন ?

একা শুইয়া শুইয়া চিন্তা করিতেছি।

বাহিরের ঘরটাতে আমি একাই শয়ন করি। এতক্ষণ সে আমার কাছেই ছিল, এইমাত্র তাহার মা আসিয়া খাইবার জন্য তাহাকে ভিতরে লইয়া গেল। সে যাইবার সময় বলিয়া গেল যে সে রাত্রে আমার নিকটেই শয়ন করিবে এবং ভ্রমরবেশী রাজপুত্রের উপাখ্যানটি শেষ পর্য্যন্ত শুনিবে। বলা বাহুল্য, আমার ইহাতে আপত্তি নাই। কিন্তু তাহার মায়ের দেখিলাম ঘোরতর আপত্তি রহিয়াছে। আসলে

ছেলেটিকে কাছে না লইয়া শুইলে তাহার ঘুম হয় না, কিন্তু সে কারণ দর্শাইল অন্যরূপ। বলিল, বালকটি ঘুমের ঘোরে এমন ঘুরপাক খায় যে তাহাকে কাছে লইয়া শুইলে স্বয়ং কুম্ভকর্ণকেও জাগিয়া বসিয়া থাকিতে হইবে।

আমি কুম্ভকর্ণ নহি, তথাপি কিন্তু ভীত হইলাম না। নাতিও আমার কানে কানে চুপি চুপি বলিয়া গেল সে সে ঠিক আসিবে, আমি যেন কপাটটা খুলিয়া রাখি।

খুলিয়া রাখিয়াছি। এবং শুইয়া শুইয়া চিন্তা করিতেছি, শিশুকে এত ভাল লাগে কেন?

নিরপেক্ষভাবে বিচার করিয়া যে কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তিই বলিতে বাধ্য যে শিশুমাত্রেই বর্ব্বর। অমার্জ্জিত, অসভ্য, নগ্ন পশু। আমরা অমার্জ্জিত, অসভ্য, নগ্ন পশু-প্রকৃতির প্রাপ্তবয়স্ক মানুষকে তো সহ্য করি না। শুধু যে সহ্য করি না তাহা নয়, এই সকল অমার্জ্জিত, অসভ্য, নগ্ন, পশু-প্রকৃতিকে দমন করিবার জন্য আমরা অর্থাৎ সুসভ্য মানবসমাজ যুগে যুগে নানা কৌশল অবলম্বন করিয়াছি। আইন, আদালত, জেলখানা, ফাঁসিকাঠ, শাস্ত্র, বচন, উপদেশ, নীতিকথা, নরক-ভীতি ইহাদের প্রত্যেকটিই পৃথকভাবে অথবা সম্মিলিতভাবে এই পশু-প্রকৃতি-দমনার্থেই ব্যবহৃত হইতেছে। মানব-মনের ও মানব-সভ্যতার একটা প্রধান দিকই এই সব লইয়া ব্যাপৃত। অথচ শিশুর মধ্যে সেই বর্ব্বরতাই আমাদিগকে আনন্দ দান করে।

কেন?

লেপটি মুড়ি দিয়া তামাক টানিতে টানিতে চিন্তা করিতে লাগিলাম। অনেক চিন্তার পর যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম তাহা এই যে, শিশুরা অসহায় বলিয়াই বোধ হয় তাহাদের প্র৷ত সভ্য

মানবমাত্রেরই একটা সহজ অনুকম্পা আছে এবং এই অনুকম্পাই ক্রমশ অনুরাগে রূপান্তরিত হয়। শুধু শিশুকে নয়, আমরা নারীকেও যে ভালবাসি এবং তাহাদের প্রতি সৌজন্য প্রকাশ করিবার জন্য ব্যগ্রতা প্রকাশ করি, তাহারও মূল কারণ বোধ হয় তাহাদের অসহায় অবস্থা। অসহায় এবং অক্ষমকে ভালবাসিয়া, রক্ষা করিয়া, সম্মান করিয়া সভ্য পুরুষ নিজের পৌরুষকেই সার্থক করে। শিশু ও নারী যদি দুর্ব্বল না হইত তাহা হইলে বোধ হয় তাহাদের নানাবিধ অযৌক্তিক অত্যাচার সহ্য করিতাম না। নারী পুরুষ হইলে শিশু প্রাপ্তবয়স্ক হইলে আর আমাদের মনোহরণ করিতে পারে না। তাহাদের অক্ষমতাই তাহাদের অস্ত্র।

সুতরাং বিশ্লেষণ করিলে ইহাই দাঁড়াইতেছে যে অসহায় বলিয়াই আমরা তাহাদের সহায়, এবং অসহায়ের প্রতি স্নেহশীল হওয়াটা সমর্থ পুরুষের অপরিহার্য্য মনোবৃত্তি।

কখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছি মনে নাই।

রাত্রে মনে হইল আমার দৌহিত্রপ্রবর আসিয়া ঢুকিয়াছেন। পাশ-বালিশটার ওধারে গুটি মারিয়া চুপ করিয়া শুইয়া আছেন এবং সম্ভবত মায়ের ভয়েই নীরব আছেন। মা টের পাইলে এখনই তুলিয়া লইয়া যাইবে। আমারও ঘুম ধরিয়াছিল, আমিও আর বিশেষ উচ্চবাচ্য করিলাম না। লেপটা ওধারে আর একটু প্রসারিত করিয়া দিলাম।

ভোরে নিদ্রাভঙ্গ হইল।

ভাবিলাম, দস্যুটাকে এইবার জাগানো যাক। ভ্রমরবেশী

রাজপুত্রের গল্পটাও এই অবসরে শেষ করিয়া ফেলি। তাহা না হইলে সমস্তদিন আমার পরিত্রাণ নাই।

বলিলাম, ওঠ হে! ভ্রমরবেশী রাজপুত্র টুকটুকে লাল ডালিম ফুলে ফুলে গুনগুন করে বেড়াচ্ছে যে! ভোর হ'ল—

ভায়ার সাড়াশব্দ নাই।

কই হে, সাড়া শব্দ নেই যে!

ভায়া নীরব।

ভাবিলাম, লেপটা তুলিয়া দিয়া একটু স্থূলগোছের রসিকতা না করিলে ভায়ার নিদ্রাভঙ্গ হইবে না।

লেপটা তুলিয়া দিলাম।

লেপ তুলিয়াই কিন্তু খড়ম তুলিতে হইল।

নাতি নয়, একটা লোম-ওঠা কুকুর। সমস্ত রাত এক লেপের তলায় আমার সঙ্গে শুইয়াছিল!

কপাট খোলা ছিল, চুপচাপ কখন ঢুকিয়াছে।

* * * *

খড়মটা বোধ হয় জোরেই লাগিয়াছিল।

কুকুরটা বাহিরে একটানা চীৎকার করিয়া চলিয়াছে—অসহায় আর্ত্ত ক্রন্দন।

মনে হইল, যেন আমার গত রাত্রির থিয়েরিটাকে ব্যঙ্গ করিতেছে।

দুর্গা, শ্রীহরি!

একটু পরেই বন্ধু ত্রিপুরাচরণ আসিয়া দর্শন দিলেন।

ত্রিপুরাচরণ মুসোলিনি ভক্ত। সুতরাং দুই চারি কথার পর আস্ফালন-সহকারে তিনি মুসোলিনির গুণগ্রাম বর্ণনা করিতে

লাগিলেন। শুনিয়া যাইতে লাগিলাম—বস্তুত না শুনিয়া উপায় ছিল না। মুসোলিনির চরিত্র-বলিষ্ঠতার ও বীরত্বের নানা কাহিনী শেষ করিয়া ত্রিপুরাচরণ বিদায় লইলে আমার মনে এই প্রশ্নের আর একটা দিক প্রকট হইল। মনে হইল, এইসব প্রবল প্রতাপশালী ডিক্টেটরগণও তো এক হিসাবে কম বর্ব্বর নহেন, ইঁহাদিগকে অসহায়ও বলা চলে না। অথচ সভ্য সমাজ তো ইঁহাদের স্বচ্ছন্দে সহ্য করিতেছে। শুধু সহ্য করিতেছে নয়, সম্ভ্রমে ও শ্রদ্ধায় গলিয়া পড়িতেছে।

কেন?

প্রকৃষ্টরূপে চিন্তার পর এই সিদ্ধান্তে শেষে উপনীত হইতে বাধ্য হইলাম। যে যে কারণে আমরা প্রাকৃতিক নানা বিপর্য্যয়কে সহ্য করি, মৃত্যুকে সহ্য করি—শুধু সহ্য করি নয়, তাহাদের কেন্দ্র করিয়া নানারূপ কবিত্ব করি এবং তাহাদের আবির্ভাবের হেতু ও যৌক্তিকতার মূল কারণ নির্দ্ধারণে অসমর্থ হইয়া অবশেষে অজ্ঞাত ভগবৎ-শক্তির আশ্রয় লই—ঠিক সেই কারণেইআমরা শিশু, নারী ও মুসোলিনিকে সহ্য করি এবং উহাদের লীলা দেখিয়া আনন্দিত হই।

অর্থাৎ গত্যন্তর নাই।

উহারা অসহায় নহে—আমরাই অসহায়। উহাদের স্বতঃস্ফূর্ত্ত অদম্য প্রাণশক্তিকে রোধ করিবার ক্ষমতা আমাদের নাই এবং নাই বলিয়াই উহাদের নানা উপদ্রবের মধ্যে একটা সৌন্দর্য্য, একটা লীলা আবিষ্কার করিয়া আমরা আমাদের অজ্ঞাতসারে নিজেদের অক্ষমতা-জনিত লজ্জাকে চাপা দিয়া জ্ঞাতসারে পুলকিত হইয়া উঠি। অমোঘ অদম্য শক্তির নিকট নতি-স্বীকার-জনিত গ্লানিকে আমরা লীলাদর্শনের আনন্দে মুছিয়া ফেলিতে চাই।

লোম-ওঠা কুকুরকে খড়ম মারিয়া তাড়াইয়া দেওয়া সহজ ; কিন্তু শিশুকে—বিশেষ করিয়া দৌহিত্রকে—প্রেয়সীকে অথবা ডিক্টেটর-গণকে অত সহজে বিদায় করা চলে না। বস্তুত, তাহা অসম্ভব—আমাদের সাধ্যাতীত। সুতরাং তাহাদের আমরা স্নেহ করি, ভালবাসি, পূজা করি।

"তুমি কেন কাল আমাকে নিয়ে শোও নি ?"

এক পা ধূলা লইয়া ও হাতে গুড় মাখিয়া দৌহিত্র আসিয়া বিছানায় উঠিল।

সহাস্য মুখে তাহাকে সম্বর্দ্ধনা করিলাম।

দামোদর

কয়েকদিন অত্যন্ত সশঙ্কিত অবস্থায় কাটিয়াছে।

এখন শঙ্কা অপনোদিত হইয়াছে এবং সমস্ত ব্যাপারটা দার্শনিক চিন্তার খোরাক জোগাইতেছে। ঘটিয়া যাইবার পর অধিকাংশ ভয়ঙ্কর ব্যাপারই দার্শনিকতার খোরাক জোগাইয়া থাকে, সেদিন যেমন ঘটিল। নিতাইবাবু ধার-কর্জ্জ করিয়া অনেক কষ্টে ছেলেটিকে মানুষ করিতেছিলেন। ছেলেটিও ভাল—যেমন দেখিতে, তেমনই পড়াশোনায়। বলা নাই কহা নাই অকস্মাৎ ছেলেটির হৃদ্‌যন্ত্র বিকল হইয়া গেল এবং ছেলেটি মারা গেল। আমরা ইহা লইয়া সকলেই পরিতাপ করিতেছিলাম, এমন সময় নিতাইবাবু নিজেই আসিয়া আমাদের প্রবোধ দিলেন। বলিলেন যে, ইহা লইয়া আক্ষেপ করা বৃথা; করুণাময় ভগবান একে একে তাঁহার বন্ধনগুলি মোচন করিতেছেন; ইহাতে বিচলিত হইলে চলিবে কেন। গত বৎসর স্ত্রী গিয়াছে, এ বৎসর ছেলেটি গেল। বাকি আছে ছোট একটা মেয়ে; কিন্তু তাহারও শরীরের যা অবস্থা—প্রত্যহই জ্বর হইতেছে, সুতরাং হয়তো শীঘ্রই তাঁহাকে সম্পূর্ণ বন্ধনমুক্ত হইতে হইবে।

এই বলিয়া নিতাইবাবু একটু হাসিলেন। যদিও তাঁহার এই মলিন হাসিটুকু ক্রন্দন অপেক্ষাও অধিক মর্ম্মান্তিক, তথাপি ইহা বেশ প্রতীয়মান হইল যে একটা দার্শনিক প্রশান্তি আসিয়া তাঁহার শোককে স্নিগ্ধ করিয়াছে। সুতরাং চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রই স্বীকার করিবেন যে, দার্শনিক চিন্তা শুধু যে আমাদের জীবনে

অনিবার্য্য তাহা নয়, ইহার উপকারিতাও যথেষ্ট। সংসারটাকে যদি মরুভূমির সহিত তুলনা করা যায়, তাহা হইলে দার্শনিক চিন্তাগুলিকে 'ওয়েসিস' বলিতে হয়। কারণ দেখিতেছি, এই সংসারে উহাদেরই আশ্রয়ে খানিকটা শান্তিলাভ করা সম্ভব। এই মরুভূমিতে উহাদেরই উদ্দেশ্যে মানুষ, উট সকলেই ছুটিতেছে। জীবনের ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল ঘটনারই একটা না একটা দার্শনিক ব্যাখ্যা খাড়া না করিলে আমাদের যেন নিদ্রাই হয় না।

এইবার যে কথাটা বলিতেছিলাম তাহাই বলি।

আসল কথাটা বলিতে গিয়া অনেক অবান্তর কথা বলিয়া ফেলিয়াছি। কিন্তু অবান্তর-কথা-প্রসঙ্গে আর একটি অবান্তর কথা লেখনীমুখে আসিয়া পড়িতেছে। কথাটি এই যে—শাখা-প্রশাখা না থাকিলে বৃক্ষ, নদী (বা সম্মিলন) যেমন সার্থকতা লাভ করে না, প্রসঙ্গত কয়েকটি অবান্তর কথার উল্লেখ না করিলেও তেমনিই কোন প্রসঙ্গই জমে না। প্রজাবৃদ্ধি ব্যাপারে ঢাক ঢোল শানাই পুরোহিত কতকগুলি মন্ত্র (অর্থাৎ বিবাহ অনুষ্ঠানটাই) অবান্তর এবং বিবাহ ব্যাপারেও বরযাত্রী কন্যাযাত্রীর দল নিরর্থক। কিন্তু মানুষের স্বভাবই এই যে—প্রজাবৃদ্ধি মানসে সে ঢাক ঢোল শানাই বাজাইয়া বিবাহ করিবে, এবং বিবাহ করিতে গিয়া একদল বরযাত্রী ও কন্যাযাত্রী জুটাইবে; অবান্তর হইলেও এসব অবশ্যম্ভাবী ও অপরিহার্য্য।

আর নয়, এইবার আসল প্রসঙ্গে আসা যাক।

কয়েকদিন অত্যন্ত সশঙ্কিত অবস্থায় ছিলাম। এই জাতীয় শঙ্কা বাল্যকালে পরীক্ষার পূর্ব্বে অনুভব করিতাম। মনে হইত, কাল প্রশ্নপত্রে কি বিভীষিকাই না জানি দেখিব। পরীক্ষাসাগরে অনেক

নাকানি-চুবানি খাইয়া তরী বহুকাল পূর্ব্বে তীরে ভিড়াইয়াছি, পরীক্ষিত বিষয়গুলির একটি বর্ণও এখন আর মনে নাই; কিন্তু পরীক্ষাটা যে সত্যসত্যই পরীক্ষা ছিল তাহা এখনও মনে রীতিমত জাগরূক আছে। সে ভীতি বিস্মৃতির তলায় এখনও তলাইয়া যায় নাই। সেদিনও তৎসম ভয়ে অভিভূত হইয়া পড়িলাম যখন ডাক-যোগে একখানি পত্র আসিয়া সবিনয়ে নিবেদন করিয়া গেল যে দামোদরবাবু আসিতেছেন।

সর্ব্বনাশ!

দামোদরবাবু লোকটি আমার অদৃষ্টপূর্ব্ব হইলেও অশ্রুতপূর্ব্ব নহেন। ইঁহার বিষয় অনেক কিছুই শুনিয়াছি এবং শুনিবামাত্রই বিশ্বাস করিয়াছি। পরের কথা বিশ্বাস করিতে অথবা পরের সম্বন্ধে চর্চ্চা করিতে কোন অর্থব্যয় হয় না বলিয়াই বোধ হয় আমরা তাহা এত সহজে করি। ভাগ্যে হয় না! হইলে তো মারা গিয়াছিলাম।

দামোদরবাবু-প্রসঙ্গে মন্দ অবশ্য কিছু শুনি নাই। পরন্তু যাহা শুনিয়াছি তাহা এত বেশিরকম ভাল যে সেই কারণেই ভয় ধরিয়া গেল।

জনশ্রুতি দামোদরবাবু অতি উচ্চস্তরের প্রাণী। ঘোর মর‍্যালিষ্ট, তাঁহার নিজস্ব একটা নৈতিক আদর্শ অনুযায়ী তিনি জীবনধারণ করেন। পুলিসে চাকুরি করেন, কিন্তু কখনও ঘুস গ্রহণ করেন নাই, মিথ্যা কথা বলেন না। অত্যন্ত নিষ্ঠাবান হিন্দু। ত্রিসন্ধ্যা করিয়া থাকেন। মস্তকে টাক টিকি দুইই আছে। অর্থাৎ এইরূপ চরিত্র-বান উন্নতমস্তক নিষ্কলঙ্ক লোক বর্ত্তমান যুগে দুর্লভ।

এহেন দামোদরবাবু আমার অতিথি হইবেন শুনিয়া ভয়ে আমার অন্তরাত্মা শুকাইয়া গেল। দামোদরবাবু না আসিয়া সুন্দরবনের

কোন ব্যাঘ্র যদি আমার অতিথি হইতে আসিতেন তাহা হইলেও, বোধ হয় আমি এতটা ভীত হইতাম না। নিখুঁত-চরিত্র দামোদর-বাবুকে লইয়া আমি যে কি করিব ভাবিয়া পাইলাম না। অপরাধের মধ্যে আমি তাঁহার দূরসম্পর্কের আত্মীয়। সম্পর্কেও আবার তিনি গুরুজনস্থানীয়—আমার স্বর্গীয়া বৈমাত্রেয় ভগিনীর মামা-শ্বশুর তিনি। আমার সহিত তাঁহার গোপনীয় কি সব কথাবার্ত্তা নাকি আছে যাহা পত্রযোগে হওয়া অবাঞ্ছনীয়; সুতরাং তিনি সশরীরে আসাই স্থির করিয়াছেন। এরূপ সর্ব্বগুণান্বিত আত্মীয়কে অতিথিরূপে লাভ করা সৌভাগ্য বলিয়া গণ্য করা উচিত। কিন্তু সত্য বলিতেছি, আমি মনে মনে মহা উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলাম। রামা, শ্যামা, হরি, যদু নহে স্বয়ং দামোদরবাবু। কি ভাবে তাঁহার সহিত চলিব, কি কথা বলিতে কি কথা বলিয়া ফেলিব, কোন্ কথায় হাসিব, কোন্ কথায় গম্ভীর হইয়া থাকিব, কিসে সায় দিব, কিসে আপত্তি করিব—ভাবিয়া চিন্তিয়া কোন কুলকিনারা করিতে পারিলাম না।

মনে মনে অনর্গল ঘামিতে লাগিলাম।

বাল্যকালের পরীক্ষার পূর্ব্ববর্ত্তী দিনগুলি যেন ফিরিয়া আসিল।

নির্দ্ধারিত দিবসটিতে পরীক্ষা যেমন অনিবার্য্যভাবে সুরু হইয়া যায়, দামোদরবাবুও তেমনই আসিয়া পড়িলেন।

আমার পুত্র তাঁহার সম্বর্দ্ধনাকল্পে ষ্টেশনে গিয়াছিল।

আমি গৃহকোণে কৃতসংকল্প হইয়া বসিয়াছিলাম যে, প্রয়োজনাতিরিক্ত কোন প্রসঙ্গে তাঁহার সহিত যদি আলোচনা করিতেই হয়, ধর্ম্মপ্রসঙ্গই উত্থাপিত করিব। সম্প্রতি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃতখানা পড়িয়াছি।

সুতরাং খানিকক্ষণ বেশ চালাইতে পারিব।

অন্তঃপুরে শুদ্ধাচার-নিষ্ঠাচারের দিকে কড়া নজর রাখিবার জন্য গৃহিণী তাঁহার গেঁটে-বাতকে উপেক্ষা করিয়া চতুর্দ্দিকে ঘোরাফেরা করিতেছিলেন। সুতরাং সেদিকে আমি নিশ্চিন্ত ছিলাম।

আমার আচরণে কোন অসঙ্গতি না প্রকাশ পায় এই ভয়েই আমি মনে মনে তটস্থ হইয়া বসিয়াছিলাম।

ষ্টেশন হইতে ঘোড়ার গাড়ি আসিয়া গেটে থামিল।

কৃষ্ণকায়, বেঁটে, মোটা, ঘাড়ে-গর্দ্দানে এক ব্যক্তি গাড়ি হইতে অবতরণ করিলেন দেখিলাম। টাক ও টিকি রহিয়াছে; সুতরাং উনিই নিঃসন্দেহে দামোদরবাবু। ভদ্রলোকের রক্তাভ চক্ষু দুইটি এত বড় যে মনে হয় যেন ঠিকরাইয়া বাহির হইয়া আসিতেছে। মুখখানি গোলাকার রোমহীন। কাঁচা-পাকা একজোড়া পুষ্ট ভ্রূ আছে। গলাবন্ধ জিনের কোট পরিধান করিয়া রহিয়াছেন। কণ্ঠলগ্ন তুলসীর মালাটিও দেখিতে পাইলাম। তাঁহার সম্বন্ধে এতকাল যাহা শুনিয়াছি তাহার সমূলকত্ব বিষয়ে সন্দিহান হইবার কোন কারণ নাই।

তিনি নিকটে আসিতেই আমি ভূমিষ্ঠ হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলাম, তাঁহার প্যানেলা জুতা হইতে কিঞ্চিৎ ধূলি লইয়া শিরোধার্য্য করিয়া ফেলিলাম।

গুরুজন!

বয়সে কিন্তু আমার অপেক্ষা প্রবীণতর বলিয়া তাঁহাকে মনে হইল না। দামোদরবাবু সস্মিত মুখে বলিলেন, থাক থাক বড় আনন্দিত হলাম বাবা, তোমাদের সব দেখে। বেঁচে থাক, দীর্ঘজীবী হও সব। নিজেদের লোক অথচ চাক্ষুস পরিচয় নেই। কার্য্য-কারণের যোগাযোগ না ঘটলে হয়তো দেখাই হ'ত না। ব'স ব'স, দাঁড়িয়ে রইলে কেন? ব'স।

অনুমতি পাইয়া আসনগ্রহণ করিলাম।

দামোদরবাবুও বসিলেন।

দুই চারি কথার পর তিনি বলিলেন, আমায় নিরিবিলি দেখে একটা ঘর দিতে হবে বাবা, বাইরের দিকে হ'লেই ভাল হয়, পূজো-আচ্চা সাধন-ভজন নিয়ে থাকি আমি—

সৌভাগ্যক্রমে বাহিরের দিকে একটি ঘর খালি ছিল। কিয়ৎকাল মধ্যেই তিনি নিজের জিনিসপত্রসহ সেই ঘরেই গিয়া প্রতিষ্ঠিত হইলেন।

আমি সম্ভ্রমসহকারে সমস্ত দিনটা দূরে দূরেই কাটাইলাম।

ভদ্রতা রক্ষার নিমিত্ত একবার তাঁহার ঘরটিতে গিয়াছিলাম, কিন্তু দামোদরবাবু বলিলেন (এবং তাঁহার ঢুলু ঢুলু চক্ষু দুইটি দেখিয়া বুঝিলাম), ট্রেনে সমস্ত রাত চোখের পাতা এক করতে পারি নি। চারটি খেয়ে ঘুমোতে হবে, স্নানটা সেরে ফেলা যাক ; সন্ধ্যাবেলা সব কথা হবে।

স্নানাদির বন্দোবস্ত করিয়া দিলাম।

শুনিলাম, স্নানান্তে তিনি অনেকক্ষণ ধরিয়া আহ্নিকাদি করিয়াছেন। এই বার্ত্তায় গৃহিণী গদগদ হইয়া গঙ্গাজলে তাঁহার খাদ্যদ্রব্যাদি পাক করাইলেন, এবং সিন্দুক খুলাইয়া শ্বেত পাথরের থালা বাটি গেলাস বাহির করিয়া গঙ্গোদকে সেগুলিকে পরিমার্জ্জিত করিতে লাগিলেন। বলিলেন যে, আমাদের ম্লেচ্ছস্পর্শদুষ্ট তৈজস-পত্রে দামোদরবাবুর মত নিষ্ঠাচারী ব্রাহ্মণকে খাইতে দিলে প্রত্যবায়গ্রস্ত হইতে হইবে।

বলা বাহুল্য, আমিও সে কথার সমর্থন করিলাম।

গৃহিণীর ধর্ম্মানুমোদিত ব্যবস্থায় ও তীক্ষ্ণ তত্ত্বাবধানে আহারাদিও

নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইয়া গেল। দামোদরবাবু আতপ-তণ্ডুল, গব্য ঘৃত এবং নিরামিষ আহার করিয়া হরিতকি চিবাইতে চিবাইতে নির্দ্দিষ্ট বাহিরের ঘরটিতে চলিয়া গেলেন এবং সমস্ত দিন আপন মহিমা লইয়া উক্ত ঘরটিতেই নিবদ্ধ রহিলেন।

অর্থাৎ দিনটা একরূপ ভালয় ভালয় কাটিল।

সন্ধ্যা হইল।

পৌত্রের নিকট খবর পাইলাম দামোদরবাবু নাকি মহাসমারোহে সন্ধ্যাহ্নিক করিতেছেন। ভৃত্য ভূতনাথ জলখাবার লইয়া গিয়াছিল, কিন্তু তাঁহাকে পূজারত দেখিয়া ফিরিয়া আসিয়াছে।

দারুণ ব্যাপার!

আর একটু পরে খবর লইয়া জানিলাম, তিনি সান্ধ্যকৃত্যাদি সমাপন করিয়াছেন। কি কথা বলিবার জন্য তিনি এতদূর কষ্ট করিয়া আসিয়াছেন তাহার কোন আভাস তো এখনও পাইলাম না। ভাবিলাম, যাই নিজেই গিয়া একবার খোঁজ-খবরটা লইয়া আসি।

গিয়া দেখিলাম কপাট বন্ধ।

অত্যন্ত সমীহভরে একবার গলা-খাঁকারি দিলাম।

কোন শব্দ নাই।

দ্বার অর্গলবদ্ধ নাকি?

ঠেলিয়া দেখিতে গিয়া কপাটটা খুলিয়া গেল এবং চোখে পড়িল তাড়াতাড়ি মুখ ধুইরা মুছিয়া দামোদরবাবু কাচের গ্লাসটি টেবিলের উপর রাখিতেছেন। আমার সহিত চোখোচোখি হইতেই তিনি সস্মিত মুখে সোচ্ছ্বাসে বলিয়া উঠিলেন, এস, দাদা এস।

এরূপ সম্পর্কবিরুদ্ধ সম্বোধনে স্তম্ভিত হইয়া গেলাম।

সকালে 'বাবা' ছিলাম, সন্ধ্যাবেলায় কি করিয়া 'দাদা' হইয়া গেলাম—চিন্তা করিতে গিয়া নিকটেই টুলের উপর ছোট বোতলটি নজরে পড়িল এবং অচিরাৎ চিন্তামুক্ত হইলাম।

ঘাম দিয়া জ্বর ছাড়িয়া গেল যেন।

আরও আনন্দিত হইলাম এই দেখিয়া যে, তিনি সেই সনাতন অজুহাতটির দোহাই দিয়া আত্মরক্ষা করিবার চেষ্টা করিতেছেন।

ডাক্তারের প্রেস্‌ক্রুপশন অনুসারেই খেতে হচ্ছে ভায়া এই অখাদ্যগুলো। উপায় কি!

সত্যই উপায় নাই। আমরাও এককালে বলিতাম। ঠিক মিলিয়া যাইতেছে।

আরামের নিশ্বাস ফেলিয়া ভাবিলাম, যাক স্ব-গোত্রই তাহা হইলে এবং প্রকৃতই আত্মীয়।

অনর্থক এতক্ষণ ঘামিয়া মরিতেছিলাম!

কিছুক্ষণের মধ্যেই পুরাদস্তুর জমিয়া উঠিল।

এমন কি, গোপনে তাঁহার জন্য পেঁয়াজি-বড়া কাটলেট প্রভৃতিও আনাইয়া দিতে হইল, এবং বহুকাল পরে দুই চারি ঢোক পান করিয়া আমিও বেশ উৎফুল্ল হইয়া উঠিলাম। ডাক্তারি ব্যবস্থার গুণে দামোদরবাবু অন্তরের সমস্ত দ্বারগুলি একে একে উন্মুক্ত করিয়া দেখাইলেন।

দেখিলাম, হুবহু মিলিয়া যাইতেছে। আমার সহিত দামোদর-বাবুর কোন তফাৎই নাই।

অকস্মাৎ দামোদরবাবু আমার হাত দুটি ধরিয়া হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। বলিলেন যে ঋণে তাঁহার মাথার চুল পর্য্যন্ত

বিকাইয়া গিয়াছে এবং এখনো বিবাহযোগ্যা দুইটি অনূঢ়া কন্যা তাঁহার মাথার উপর খড়্গের মত ঝুলিতেছে। আমার নিকট তিনি আসিয়াছেন কিছু অর্থ-সাহায্যের জন্য। যদি আমি দয়া করিয়া—

আর তিনি বলিতে পারিলেন না।

আমার হাত দুইটি চাপিয়া ধরিয়া নীরবে অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

কাল দামোদরবাবু চলিয়া গিয়াছেন।

অত্যন্ত বেদনাভরে তাঁহার কথা একান্তে বসিয়া স্মরণ করিতেছি। দামোদরবাবু যদি কোন যুবতী হইতেন তাহা হইলে মর্ম্মদর্শী কবিগণ হয়তো আমার এ বেদনাকে বিরহ-বেদনা নামে অভিহিত করিতেন। সত্যই দামোদরবাবুর বিরহে নিদারুণ বেদনা অনুভব করিতেছি। সত্যই তাঁহাকে ভালবাসিয়া ফেলিয়াছি। কিন্তু আশ্চর্য্য হইয়া মনকে প্রশ্ন করিতেছি, কেন?

যতক্ষণ তাঁহাকে নির্ম্মলচরিত্র নিষ্ঠাবান নিখুঁত ব্যক্তি বলিয়া জানিয়াছিলাম ততক্ষণ সভয়ে তাঁহার সান্নিধ্য এড়াইয়া চলিতেছিলাম। কিন্তু যেই তাঁহাকে নেশাখোর ও দেনাগ্রস্ত বলিয়া জানিতে পারিলাম, অমনই তাঁহাকে ভাল লাগিয়া গেল। আশ্চর্য্য তো! নৈতিক আদর্শের দিক হইতে এরূপ মনোবৃত্তি মোটেই সমর্থনযোগ্য নহে!

মন উত্তর দিতেছে—কিন্তু ইহাই সনাতন মনোবৃত্তি। আমরা মহৎকে শ্রদ্ধা করি, কিন্তু ভালবাসি তাহাকেই যাহার শত দোষ সম্বন্ধে আমরা সচেতন। যে কারণে স্ত্রীকে, পুত্রকে এবং নিজেকে বহু-দোষ-সত্ত্বেও ভালবাসি, ঠিক সেই একই কারণে দামোদরকেও ভালবাসিয়াছি। দোষ আছে বলিয়াই দামোদরের সহিত নিজের

একত্ব ও .আত্মীয়তা এত সত্যভাবে অনুভব করিতেছি। একই আমরা! নানা দোষে দুষ্ট—নির্ম্মম প্রকৃতির তাড়নায় অসহায়—দুর্ব্বার জীবন-স্রোতে বিপর্য্যস্ত। উভয়েই অসহায় বলিয়া পরস্পরকে আঁকড়াইয়া ধরিতে চাই। বিগত ভূমিকম্পের সময়ে ধনী-নির্ধন, উচ্চ-নীচ, সভ্য-অসভ্য অত্যন্ত অসহায়ভাবে কয়েকদিনের জন্য নীল আকাশের তলে দাঁড়াইয়া যে কারণে একাত্মতা অনুভব করিয়াছিলাম, ঠিক সেই একই কারণে মদ্যপায়ী দেনাগ্রস্ত আমি মদ্যপায়ী দেনাগ্রস্ত দামোদরের জন্য ব্যাকুল হইতেছি। এখন তাহার সত্যমূর্ত্তি দেখিতে পাইয়াছি; মিথ্যা জনশ্রুতির কুজ্ঝটিকা যেন চিরপরিচিত বটগাছটাকে কিম্ভূতকিমাকার দৈত্যে পরিণত করিয়াছিল। কুয়াসা কাটিয়া গিয়াছে, বটগাছটার সনাতন রূপ দর্শন করিয়া স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিয়াছি। দামোদর এতদিন নামেই আত্মীয় ছিল, এইবার সত্য সত্যই তাহার আত্মার আশ্বাস পাইয়াছি।

মনের যুক্তির উত্তরে কি বলিব মাথায় আসিল না।

এখন ভাবিতেছি, দামোদরকে কি উপায়ে কিছু অর্থ-সাহায্য করা যায়। তাহাকে মিথ্যা স্তোকবাক্য দিয়া বিদায় করিয়াছি। ভাগ্যে ব্যাঙ্ক বন্ধ, ছুটি ছিল। তাহাকে বলিয়াছি যে ব্যাঙ্ক খুলিলেই টাকা বাহির করিয়া কিছু তাহাকে পাঠাইয়া দিব।

হায় দামোদর, আমার ব্যাঙ্ক-ব্যালান্সের খবর যদি রাখিত! অকপটে তাহার নিকট স্বীকার করিলেই চুকিয়া যাইত। কিন্তু কেমন যেন চক্ষু-লজ্জা হইল—পারিলাম না। আহা, বেচারী এত আশা করিয়া আসিয়াছে! ধার করিয়াও দিতে হইবে। তাহা ছাড়া প্রেস্‌টিজ! প্রিয়বন্ধু প্রাণকান্তের শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া

দেখিতেছি উপায় নাই। সে সম্প্রতি প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড বাবদ কিছু টাকা পাইয়াছে। সে ইচ্ছা করিলে কিছু দিতে পারে। কিন্তু সরল সত্য কথাটি বলিলে সে এক পয়সাও দিবে না। তাহাকে তো চিনি !

কি জাতীয় মিথ্যা গল্প রচনা করিলে প্রাণকান্তের মন বিগলিত করিতে পারিব—ব্যাকুল অন্তরে তাহাই চিন্তা করিতেছি। দামোদরের অশ্রুভারাক্রান্ত ড্যাবডেবে চোখ দুইটা বারম্বার মনে পড়িতেছে।

শরীর, মন ও মানুষ

কান কটকট করিতেছে।

মনে হইতেছে—গত রাত্রির দুষ্কৃতির জন্য কোন অদৃশ্য গুরু-মহাশয় যেন নির্ম্মমভাবে কানটিকে মলিয়া দিতেছেন। অন্তরাত্মা অপরিসীম যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে। গত রাত্রির দুষ্কৃতিটি কি তাহা বলিতেছি। বেশ বুঝিতে পারিতেছি, বিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই অভিমত প্রকাশ করিবেন যে আমার দুর্ব্বুদ্ধি ঘটিয়াছিল, যে শাস্তি আমি ভোগ করিতেছি তাহা ন্যায্য এবং অপরাধের উপযুক্ত। এইটুকু শুধু আশা যে পৃথিবীর অধিকাংশ লোকই বিজ্ঞ নহেন। অবিজ্ঞগণই সংখ্যাগরিষ্ঠ, সুতরাং সাহানুভূতি মিলিলেও মিলিতে পারে।

গতকল্য সান্ধ্যভ্রমণে বাহির হইয়া গ্রামপ্রান্তের নদীতীরে গিয়া উপবেশন করিয়াছিলাম। অনেকদিন বাড়ি হইতে বাহির হই নাই—নদীতীর বড় ভাল লাগিল। আবাল্যপরিচিত এই নদীই মনে অবর্ণনীয় মোহ-সঞ্চার করিয়া বসিল। অনেকক্ষণ নির্নিমেষনেত্রে চাহিয়া বসিয়া রহিলাম। অস্তমান সূর্য্য, উদীয়মান চন্দ্র, শুভ্র বালুকাময় তটভূমি, শীর্ণকায়া নদীটির স্বচ্ছ তরল তরঙ্গভঙ্গিমা, ঘনায়-মান অন্ধকার—সকলে যেন আমাকে পাইয়া বসিল, উঠিতে দিল না। অনেকক্ষণ বসিয়া রহিলাম। কেন বসিয়া রহিলাম, কি লাভ হইল—এ সব লইয়া বাগ্‌বিন্যাস করা বৃথা। আসল কথা, মন বলিল—বসিয়া থাক, আমিও বাধ্য বালকের মত সশরীরে বসিয়া রহিলাম। অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল।

জ্যোৎস্নায় পৃথিবী ভরিয়া উঠিয়াছে। সহসা নজরে পড়িল

জ্যোৎস্নামণ্ডিত নদীস্রোতে একটি শ্বেতকমল ভাসিয়া আসিতেছে। সুন্দর ফুলটি। জলের কাছেই বসিয়া ছিলাম। লাঠিটা বাড়াইয়া ফুলটিকে টানিয়া লইবার চেষ্টা করিলাম, পারিলাম না। হঠাৎ কেমন যেন ঝোঁক চাপিয়া গেল, ফুলটাকে লইতে হইবে। জুতা খুলিয়া জলে নামিলাম, হাঁটু-জল পর্য্যন্ত আগাইয়া গেলাম, ফুল তবু কিন্তু নাগালের মধ্যে আসিল না। আরও খানিকটা গিয়া লাঠিটা বাড়াইলাম। ঠিক কি ঘটিল জানি না, সম্ভবতঃ শরীরের ভারকেন্দ্রেই কোন প্রকার গোলযোগ ঘটিয়া থাকিবে, টাল সামলাইতে পারিলাম না, পড়িয়া গেলাম। কাপড়জামা তো ভিজিলই, কর্ণকুহরেও জলবিন্দু প্রবেশ করিল। সেই বিন্দু এখন সিন্ধুপ্রমাণ হইয়া আমার সমস্ত সত্তাকে বিক্ষুব্ধ করিয়া তুলিয়াছে।

বলা বাহুল্য, গৃহিণীর নিকট সমস্ত ব্যাপারটা আদ্যোপান্ত চাপিয়া গিয়াছি। নদীতীর হইতে সিধা প্রিয় বন্ধু প্রাণকান্তের বাড়িতে গিয়া পরিচ্ছদাদি পরিবর্ত্তন করিয়া বাড়ি ফিরিয়াছি। প্রাণকান্ত ব্যাপারটা জানে।

যন্ত্রণা ভোগ করিতে করিতে এখন চিন্তা করিতেছি যে, এই অশক্ত শরীরের সঙ্গে অত্যুৎসাহী বালক-স্বভাব মনের এই সংযোগ কেন। এ সংযোগ না ঘটিলে তো এ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইত না!

শরীরের সহিত মনের যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু একটু প্রণিধান করিলেই ইহা প্রতীয়মান হইবে যে, এই ঘনিষ্ঠতা বিস্ময়কর। উভয়ের মধ্যে মিল তো কিছুই নাই, বরং অমিলই বেশি। একের ধর্ম্ম, রুচি, আচরণ অপরের ধর্ম্ম, রুচি ও আচরণের বিপরীত বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না।

দেহ জড়ধর্ম্মী। তামসিক প্রকৃতি তাহার মজ্জাগত। মনের

আধ্যাত্মিক বিলাসের কথা দূরে থাক, রাজসিক বিলাসও শরীর বেশিক্ষণ সহ্য করিতে পারে না। যে পঞ্চ-ইন্দ্রিয়কে আশ্রয় করিয়া মন ইন্দ্রিয়াতীত লোকে বিহার করিতে চায় পঞ্চ ইন্দ্রিয়ই তাহার প্রধান বাধা। দেহ বস্তুসর্ব্বস্ব স্থূল, সুতরাং ক্ষণভঙ্গুর। মন সূক্ষ্মমর্ম্মী অতীন্দ্রিয়বিলাসী, অমৃতকামী। স্বপ্ন-সরণির পথিক সে। অতি-বাস্তব এই দেহটা সে পথে তাহার সঙ্গী হইতে পারে না। কানে এক ফোঁটা জল ঢুকিলেই সে কাবু হইয়া পড়ে। মনের বিলাস-প্রেরণার সহিত পাল্লা দিবার ক্ষমতা দেহের নাই। চির-উৎসুক, চির-কৌতূহলী চির-উর্দ্ধগ মনের সহিত মাধ্যাকর্ষণ-ক্লিষ্ট স্থূল স্থবির দেহটা কিছুতেই নিজকে মানাইয়া লইতে পারে না। শরীর ও মনের এই শোচনীয় দ্বন্দ্বের নিদর্শন আমরা হিমালয়-অভিযানে, উত্তরমেরু-আবিষ্কারে, বৈজ্ঞানিকের গবেষণাগারে, ভগ্নস্বাস্থ্য লেখকের সকরুণ মুখচ্ছবিতে দেখিতে পাই। অর্থাৎ দেখিতে পাই যে, কল্পনাবিলাসী মন আপন আদর্শের যূপকাষ্ঠে দেহটাকে বলিদান দিতেছে।

মানুষের মন কবে হিমালয়ের উচ্চতম শিখরে আরোহণ করিয়া বসিয়া আছে, দেহটা আজও সেখানে পৌঁছিতে পারিল না। যদি কোন দিন পৌঁছিতেও পারে, গিয়া দেখিবে—মন সেখানে নাই, সে উর্দ্ধতর কোন লোকে গিয়া বসিয়া আছে। গ্রহে গ্রহে তারায় তারায় নীহারিকা-মণ্ডলীর অজাত জ্যোতির্বাষ্পে অসীম ঔৎসুক্যভরে মন সঞ্চরণ করিয়া বেড়াইতেছে। মনের এই অনন্ত পর্য্যটনের সঙ্গী হওয়া দেহের পক্ষে অসম্ভব।

কারণ উভয়ে ভিন্নধর্ম্মী।

সহজভাবেই দেখুন না, দেহের পুষ্টির জন্য প্রয়োজন খাদ্য। কিন্তু মনের পুষ্টির জন্য যাহা প্রয়োজন তাহা অখাদ্য, অর্থাৎ সাহিত্য, দর্শন,

ইতিহাস, বিজ্ঞান,—চর্ব্ব্য, চূষ্য, লেহ্য, পেয় কোন পর্য্যায়েই পড়ে না। শরীরের পক্ষে উপযোগী টাটকা জিনিস, কিন্তু মনের বেলায় এ নিয়ম খাটে না। বরং বিপরীত নিয়মটাই মনের পক্ষে প্রযোজ্য। সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস, বিজ্ঞান, সমাজতত্ত্ব যত বাসী অর্থাৎ পুরাতন হইবে ততই তাহা মনের পক্ষে উপকারী। কালের কষ্টিপাথরে যাচাই না হওয়া পর্য্যন্ত অধিকাংশ জিনিসই মনের পথ্য হয় না। এ বিষয়ে মন কুম্ভীর-প্রকৃতির—প্রাচীন পচা জিনিসেই তাহার পুষ্টি ও তৃপ্তি। টাটকা তত্ত্ব বা তথ্য সে নাড়িয়া চাড়িয়া দেখে বটে, কিন্তু সে নির্ভর করে পুরাতনের উপর। শুধু সাহিত্যের ক্ষেত্রে নয়, অন্যান্য ক্ষেত্রেও ইহা সত্য। বন্ধুত্ব বলুন, প্রেম বলুন, যত বাসী হইবে ততই মূল্যবান। 'ভালবাসি' কথাটাই হয়তো মনের এই বাসী-প্রিয়তা হইতে উদ্ভূত।

সুতরাং দেখা যাইতেছে, মনের সহিত শরীরের অমিল যথেষ্ট। অথচ এই দুই অসদৃশ বস্তু (মনকে বস্তু বলা যায় কিনা জানি না) পরস্পর নির্ভরশীল।

চমকাইয়া উঠিলাম।

মস্তকে কে খানিকটা জল ছিটাইয়া দিল।

গঙ্গা—গঙ্গা—গঙ্গা—গৃহিণী তাঁহার দৈনন্দিন পূজা সমাধা করিয়া চতুর্দ্দিকে গঙ্গাজল ছিটাইতেছেন। রসিকতা করিয়া কিছু বলিব ভাবিতেছি, এমন সময় সহসা তিনি চীৎকার করিয়া উঠিলেন—

গেল—গেল—গেল—হু উ-স্—বড়িগুলোতে মুখ দিলে কাগে। আঃ, মুখপোড়া কাগের জ্বালায় পাগল হলাম যে গা। ভূতো, তুই কি চোখের মাথা খেয়েছিস না কি—চর্ব্বি আন্দোলিত করিয়া বায়সের উদ্দেশ্যে গৃহিণী প্রধাবিত হইলেন। আমি মাথাটা কোঁচার খুঁটে মুছিয়া ফেলিয়া ভাবিতে লাগিলাম, আমার ন্যায় সংশয়ী, দার্শনিকতা-

প্রবণ ব্যক্তিটির সহিত যে বিধাতা এই মেদবহুলা, ভক্তিমতী বড়ি-পরায়ণা রমণীটির মিলন সংঘটিত করিয়াছেন, জড়ধর্ম্মী শরীরের মধ্যে প্রেরণাধর্ম্মী মনঃসংযোগ সম্ভবত তাঁহারই কীর্ত্তি।

নাতিনী আসিয়া দেখা দিলেন।

দাদামশাই, দেখুন কেমন সুন্দর ফুলটি!

দেখিলাম। দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গেলাম, হয়তো কোন বিলাতী মরশুমি ফুল। কিন্তু কি চমৎকার! কালোর উপর সাদা সদা ফোঁটা —অপরূপ!

বলিলাম, খাসা ফুল তো। এস খোঁপায় গুঁজে দি তোমার।

খোঁপায় ফুল গুঁজিয়া নাতিনী চলিয়া গেলেন।

আমার মনে নূতন আলোকপাত হইল।

সর্ব্ববিষয়েই দেখিতেছি, পরস্পরবিরোধী দুইটি বস্তুর সংযোগ সাধন করাই যেন বিধাতার লক্ষ্য। ভাব ও ভাষা, কবিতা ও ছন্দ, জীবন ও মৃত্যু, জল ও স্থল প্রভৃতি বহু বিপরীতধর্ম্মী জিনিসকে একত্রে গ্রথিত করিয়াই তিনি ক্ষান্ত হন নাই, উভয়ের সমন্বয় সাধন করিয়াছেন।

এরূপ না করিলে হয়তো সৃষ্টির সমতা রক্ষা হইত না—হ্রস্বদীর্ঘের সুনিপুণ সম্মিলন না ঘটাইলে হয়তো তাঁহার এই মহাকাব্যের ছন্দ-পতন হইত। যতই চিন্তা করিতে লাগিলাম, ততই স্পষ্টতর হইতে লাগিল—পরস্পরবিরোধী শক্তির মিলনই সম্মিলন—সার্থক মিলন।

এই মিলনের ফলেই জড়তা চাঞ্চল্য অনুভব করে এবং অতিচঞ্চল প্রশমিত হয়। সংসার-বিরাগী শিবকে বন্দী করে উমার বাহুপাশ, এবং মায়াময়ী উমাকে ভূমা-উন্মুখ করেন শ্মশানবিলাসী শিব। সহসা যেন বুঝিতে পারিলাম—পরস্পরবিরোধী শক্তির মিলনই সৃষ্টি-

সৌন্দর্য্যের উৎস। আলোক-অন্ধকারের মিলন-মহিমাই সন্ধ্যা-ঊষার বর্ণ-বৈচিত্র্য, বায়বীয় পুষ্পসুরভি বৃন্ত-বন্দিনী পুষ্পকলিকার মর্ম্মবাণী, বিপরীতধর্ম্মী তুই বিদ্যুতপ্রবাহের সমন্বয়ই বিদ্যুৎ-লীলা। শরীর ও মন, স্বামী-স্ত্রী···

চিন্তাস্রোত পুনরায় ব্যাহত হইল।

প্রিয় বন্ধু প্রাণকান্ত আসিয়া প্রবেশ করিলেন।

আসিয়াই তিনি অতিশয় বস্তুতান্ত্রিক একটি প্রশ্ন করিয়া বসিলেন, ওহে, তোমার নাত্নির বিয়ে কি বুড়ীর সঙ্গেই দেবে না কি! মেয়েটি কিন্তু কুচকুচে কালো—একেবারে ইথিওপ তা ব'লে রাখছি!

অবিচলিতকণ্ঠে বলিলাম, কালো ব'লেই দেব।

মানে?

মানে নাতি আমার ফরসা—রাধাকৃষ্ণের মিলনই আদর্শ মিলন।

বিপরীতধর্ম্মী তুই বস্তুর মিলন যে কিরূপ হৃদয়গ্রাহী এবং কিরূপে তাহা সৃষ্টির সঙ্গতি রক্ষা করিয়া বিধাতার অভিপ্রায়কে সার্থক করিয়া তুলিতেছে, ওজস্বিনী ভাষায় তাহা তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিলাম।

ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া প্রাণকান্ত কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকাইয়া রহিলেন।

তাহার পর বলিলেন, আমার বিশ্বাস কান দিয়া জল তোমার মস্তকের ভিতরেও ঢুকিয়াছে। তাহা না হইলে ইহা বোঝা তোমার পক্ষে মোটেই শক্ত হইত না যে, বিধাতার অভিপ্রায়-অনুসারে না চলাই মনুষ্যত্ব। মৃত্যু বিধাতার বিধান—মানুষ অমরত্ব আকাঙ্ক্ষা করে। বিধাতা মানুষকে ডানা দেন নাই, মানুষ আকাশে উড়িতেছে। বিধাতা মানুষের দৃষ্টিশক্তি ও শ্রবণশক্তির একটা সীমা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন···কেন দিয়াছেন তিনিই জানেন—কিন্তু

মানুষ তাঁহার সে নির্দ্দেশকে অগ্রাহ্য করিয়া টেলিস্কোপ, মাইক্রোস্কোপ, রেডিও বানাইয়া বসিয়াছে। নারীমাত্রেরই গর্ভে সন্তান উৎপাদন করিবার ক্ষমতা ও প্রবণতা পুরুষমাত্রকেই দিয়াছেন, কিন্তু সে ইচ্ছা যাহারা চরিতার্থ করিতে চায়, আমরা তাহাদের মানুষ বলি না—জানোয়ার বলি। বিধাতার বিধানের বিপরীত বিধানই মানুষের পক্ষে শোভন ; সুতরাং তোমার যুক্তিকে সত্য বলিয়া ধরিলে তোমার নাতির জন্য ফরসা মেয়েই দেখিতে হয়। বুড়ী অবশ্য আমার ভাইঝি এবং আমাকেই তাহার বিবাহ দিতে হইবে। কিন্তু তাই বলিয়া তোমার একটা বাজে যুক্তির আমি সমর্থন করিতে পারি না।

ব্যথিত কর্ণমূলে হাত বুলাইতে বুলাইতে আমি ভাবিতে লাগিলাম—প্রাণকান্তও বিধাতার অপূর্ব্ব সৃষ্টি।

বঙ্কিম-শতবার্ষিকী

গভীর অভিনিবেশ সহকারে চিন্তা করিতেছিলাম।

সাহিত্য-চর্চ্চা যখন করি তখন বঙ্কিম-শতবার্ষিকীতে চিন্তিত না হইয়া উপায় নাই। সুতরাং চিন্তা করিতেছিলাম। চিন্তা করিতেছিলাম প্রবন্ধ না লিখিয়া বকিম-শতবার্ষিক উৎসব কি অন্য কোন সদুপায়ে সুসম্পন্ন করা যায় না? বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাবলী বিশ্লেষণ করিয়া বাগ্‌বিস্তার করিতেই হইবে? ভাগীরথীর সলিল বিশ্লেষণ করিয়া ভগীরথের মাহাত্ম্য-কীর্ত্তন!—কেমন যেন মনঃপূত হইতেছে না। বঙ্কিম-সাহিত্যের উপর প্রবন্ধ লিখিয়া লাভ কি? যাঁহারা সাহিত্য-রসিক তাঁহারা বঙ্কিম-সাহিত্যরস পান করিয়া তৃপ্ত হইয়াছেন অথবা হইবেন। প্রবন্ধ-রূপ ফিডিং-বট্‌লের তাঁহাদের কোন প্রয়োজনই নাই। আর যাঁহারা সাহিত্য-রসিক নহেন, সত্যকার রসবোধ যাঁহাদের নাই, প্রবন্ধ গিলাইয়া তাঁহাদের সুরসিক করিয়া তোলা অসম্ভব। অন্ধকে হাত ধরিয়া মনুমেণ্টের উপর চড়াইয়া দিলেই তাহার দৃষ্টি দিগন্তপ্রসারী হইয়া উঠে না। অরসিক পাঠক পাণ্ডিত্য-পূর্ণ প্রবন্ধ গলাধঃকরণ করিয়া সাধারণ দর্শকের মনে আতঙ্ক অথবা বিস্ময় সঞ্চার করিতে পারেন বটে, কিন্তু দ্রষ্টাকে প্রতারিত করিতে পারেন না। প্রতারিত করিতে পারেন না, কিন্তু বিব্রত করিতে পারেন। চতুর্দ্দিকে পাণ্ডিত্যের জ্বালায় অস্থির হইয়া উঠিয়াছি। সাহিত্য-কানন ইডেন গার্ডেন না হইয়া কিচেন গার্ডেন হইয়া উঠিয়াছে। রসিকচূড়ামণি বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মতিথি উৎসবে আর লাউ, কচু, কুমড়া, কদলী আমদানি করিতে প্রবৃত্তি হইতেছে না।

প্রতিভাবান প্রবন্ধ-লেখককে ভয় করি না। ভয় করি প্রবন্ধ-আস্ফালককে। কোন মনীষী-ময়ূরের পক্ষে দুই চারিটি প্রবন্ধ-পালক ত্যাগ করা অসম্ভব অথবা অবাঞ্ছনীয় নহে। কিন্তু *পুরাতন সেই* গল্পটি মনে উদিত হইলে স্বতঃই বলিতে ইচ্ছা করে—হে ময়ূরগণ, ভগবৎ-প্রসাদে তোমরা নয়নরঞ্জন পালকের অধিকারী হইয়াছ স্বীকার করি, এবং ইহাও স্বীকার করি যে, তোমরা ইচ্ছা করিলেই দুই চারিটি পালক ছাড়িতেও পার, কিন্তু দোহাই তোমাদের, যেখানে সেখানে এবং যখন তখন পালক-মোচন করিও না। কারণ পৃথিবীতে দাঁড়কাক আছে।

আর একটা কথাও বিবেচ্য।

বঙ্কিমচন্দ্রকে উপলক্ষ করিয়া প্রবন্ধ-বাজি অথবা গলা-বাজি করিলে বঙ্কিমচন্দ্র অপেক্ষা নিজেকেই কি বেশি জাহির করা হয় না? যেমন দুর্গাপূজাকে উপলক্ষ করিয়া প্রতি বৎসর হারু পোদ্দার কাড়া-নাকাড়া-দামামা পিটাইয়া আত্মঘোষণা করেন, দেশসেবা উপলক্ষে যেমন খ্যাত অখ্যাত খদ্দরধারী কত আত্ম-প্রচারক নানা মঞ্চে দণ্ডায়মান হইয়া স-নির্ঘোষে নিজেদের ও দেশসুদ্ধ লোককে ঘর্ম্মাক্ত করিয়া তোলেন, ক-বাবুর ছেলের বিবাহ উপলক্ষে অথবা খ-বাবুর পিতার শ্রাদ্ধ উপলক্ষে খাইতে গিয়া গ-বাবুর পত্নী অথবা ঘ-বাবুর কন্যা যেমন নিজেদের বস্ত্র অলঙ্কার রূপ বিজ্ঞাপিত করিয়া বেড়ান—আমরাও কি সেইরূপ বঙ্কিমের জন্মতিথিকে উপলক্ষ করিয়া নিজেদের নিজেদের বিদ্যা-আস্ফালন করিতে থাকিব?

অনেক চিন্তার পর স্থির করিলাম, থাকিব—আলবৎ থাকিব। সাহিত্য-চর্চ্চা করি বলিয়া আমরা মনুষ্যধর্ম্মচ্যুত হই নাই। মনুষ্যোচিত সমস্ত দুর্ব্বলতা আমাদের আছে এবং আমরা এ সুযোগ কিছুতেই

উপেক্ষা করিব না। করিবার হেতু কি থাকিতে পারে? মন কিন্তু বলিতে লাগিল, আর যাই কর প্রবন্ধ লিখিও না। বরং বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মনিশীথে ছাদের উপর বসিয়া নানা রঙের বড় বড় ফানুস ছাড়। অন্ধকার মহাশূন্যে লাল, নীল, পীত, হরিৎ—নানা বর্ণের একশত ফানুস সারি সারি উড়াইয়া দাও। মহাকবি বঙ্কিমচন্দ্রকে স্মরণ করিয়া অন্ধকারের বক্ষে আলোর আলিপনা আঁক। আলো কিছুক্ষণ পরে নিবিয়া যাইবে। তোমার প্রবন্ধই কি চিরকাল বাঁচিয়া থাকিবে? আজিকার দিন পাণ্ডিত্য-প্রকাশ করিবার দিন নয়, সকলে মিলিয়া আনন্দ প্রকাশ কর। রোমে যেমন কার্নিভাল উৎসব হইত, তেমনই একটা উৎসবের অনুষ্ঠান কর না কেন? বহুবর্ণ বিচিত্রিত পরিচ্ছদে মাংসময় দেহটাকে আবৃত করিয়া কৃত্রিম ছদ্মবেশে নিজেদের কৃত্রিমতার ঝুটা ব্যক্তিত্বকে অবলুপ্ত করিয়া দিয়া আজ রাজপথে বাহির হইয়া পড়। সমস্ত বন্ধন খসিয়া পড়ুক, সমস্ত বাধা সরিয়া যাক। মহানন্দে আজ সকলে উৎসবে মাতিয়া উঠ। হেদুয়া-পুষ্করিণীর জল তুলিয়া ফেলিয়া রক্তের মত গাঢ় লাল রঙে তাহা পরিপূর্ণ কর। এমন দিনে আষাঢ় মাসে হোলি খেলিলেও অশোভন হইবে না। গোলদীঘিতেই বা জল থাকিবার প্রয়োজন কি? উৎকৃষ্ট সুবায় তাহা কানায় কানায় ভরিয়া দাও। পার্কে পার্কে রূপের হাট বসিয়া যাক, মাঠ ঘাট বাট আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠুক। গড়ের মাঠে সমবেত হইয়া—বক্তৃতা নয়—একটা বিরাট অগ্নিকাণ্ডের আয়োজন কর। দেশের সমস্ত আবর্জ্জনা স্তূপীকৃত করিয়া তাহাতে অগ্নি-সংযোগ করিয়া দাও। লকলকায়িত অনলশিখা গগনস্পর্শী হইয়া উঠুক। তোমরা দাঁড়াইয়া দেখ। প্রবন্ধ লিখিয়া কি হইবে?

উচ্ছ্বাসের মুখে বাধা পড়িল।

দ্বারপ্রান্তে একটি মনুষ্যমূর্ত্তি দেখা দিল। শীর্ণকান্তি প্রৌঢ় একটি ব্রাহ্মণ। পরিধানে অর্দ্ধমলিন বস্ত্র, পায়ে ধূলিধূসরিত চটি, হস্তে থেলো হুঁকা। নগ্নগাত্রে শুভ্র উপবীতগুচ্ছ শোভা পাইতেছে। কোটরগত চক্ষু দুইটি উন্মীলিত, কিন্তু পারিপার্শ্বিকের সম্বন্ধে সচেতন নহে। কেমন যেন তন্দ্রাতুর—স্বপ্নাচ্ছন্ন।

যদি অনুমতি করেন প্রবেশ করি।

আসুন আসুন, বসুন। কি চান আপনি?

ব্রাহ্মণ ভিতরে প্রবেশ করিলেন। চৌকিতে উপবেশন করিয়া বলিলেন দেখুন, চাহিবার দিন ফুরাইয়া গিয়াছে। সরলভাবে আজকাল কেহ কিছু চাহে না, সরলভাবে কেহ কিছু দেয়ও না। বর্ত্তমান কালে প্রার্থী মানেই ভেকধারী, দাতা মানেই নির্ব্বোধ। দাতা-গ্রহীতার মধুব সম্পর্ক উঠিয়া গিয়াছে। অর্থাৎ সে দিন আর নাই, যখন দাতা দান করিয়া ধন্য হইত এবং গ্রহীতা দান গ্রহণ করিয়া নিজেকে কৃতার্থ মনে করিত এবং উভয়েই তাহা সরলভাবে প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হইত না। সুতরাং আজকাল প্রকৃত প্রয়োজন থাকিলেও চাহিতে ভরসা হয় না।

সঙ্কোচভরে জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনার যদি কিছু প্রয়োজন থাকে তো—

মনুষ্যমাত্রেরই প্রয়োজন থাকে। কিন্তু মনুষ্যমাত্রেরই পরের প্রয়োজন মিটাইবার সামর্থ্য, সুযোগ অথবা সহৃদয়তা থাকে না। বর্ত্তমানে আমার যাহা প্রয়োজন, তাহা আধ্যাত্মিক নহে, নিতান্তই আধিভৌতিক। সেইজন্য ব্যক্ত করিতে লজ্জিত হইতেছি। অর্থাৎ আমি কিছু অর্থ-সংগ্রহের জন্য বাহির হইয়াছি।

ব্রাহ্মণ বলিয়া চলিলেন, আপনার আচরণ দেখিয়া মনে হইতেছে

যে, আপনি হয়তো আমাকে সাহায্য করিলেও করিতে পারেন। প্রথমেই আপনাকে জানাইয়া দিতেছি যে, আমি নিজের জন্য কখনও কাহারও নিকট অর্থ-ভিক্ষা করি নাই, আজও করিতেছি না। আজ আপনারা বঙ্কিম-শতবার্ষিক উৎসব করিতেছেন। আমিও আজ সেই উৎসব করিব। কিন্তু আমি নিজের মত করিয়া করিব।

উৎসাহিত হইয়া প্রশ্ন করিলাম, কি রকম?

ব্রাহ্মণ বলিলেন, এই উৎসব উপলক্ষে একটি বিবাহ ও একটি ভোজ আমি দিতে চাই। আপনারা যে ভাবে উৎসব করিতেছেন, তাহা আমার মনঃপূত হইতেছে না। কিন্তু আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ। আমার কল্পনা আছে, অর্থ নাই। আপনারা যদি সাহায্য করেন, আমার কল্পনাকে রূপ দিতে পারি।

লোকটা পাগল নয় তো!

প্রশ্ন না করিয়া পারিলাম না, বিবাহ? কাহার বিবাহ?

ফুলের বিবাহ। সত্য সত্যই আজ মহাসমারোহে মল্লিকার সহিত গোলাপের বিবাহ দিতে চাই। আপনারা কি দেখিতে পান না—আজকাল শত শত মল্লিকা ফুটিয়া ফুটিয়া ঝরিয়া পড়িতেছে, শত শত গোলাপ বিশুষ্ক বিশীর্ণ হইয়া যাইতেছে? তাহাদের বিবাহ আজকাল আর হয় না। হইবার উপায় নাই। বঙ্কিমের জন্মতিথি-উৎসবে আমি মহাসমারোহে একটি মল্লিকার সহিত একটি গোলাপের বিবাহ দিতে চাই। কিন্তু তজ্জন্য অর্থের প্রয়োজন। সেকালে মল্লিকার সহিত গোলাপের বিবাহ দিতে গেলে বিশেষ কিছু খরচ হইত না। ভ্রমর ঘটকালি করিত, উচ্চিঙ্গড়া নহবত বাজাইত, মৌমাছি সানাইয়ের বায়না লইত, খদ্যোতেরা ঝাড় ধরিত, আকাশে তারাবাজি হইত, কোকিল আগে আগে ফুকরাইত। সর্ব্বশেষে

একখানি কোমল হস্ত তাহাদের তুলিয়া লইয়া একসূত্রে একমালায় গাঁথিয়া দিত। কিন্তু এখন সে সব দিন আর নাই। ভ্রমর, উচ্চিঙ্গড়া, মৌমাছি, খদ্যোত, কোকিলরা মাথা গুঁজিবার ঠাঁই পায় না। চারিদিকে পাকা বাড়ি, পাকা রাস্তা, চতুর্দ্দিক প্রস্তরময়। সব শানবাঁধানো—এতটুকু ঘাস গজাইবার উপায় নাই। সমগ্র সভ্য সমাজ মৃত্তিকাহীন। মল্লিকা ও গোলাপ বহুস্থানে টব আশ্রয় করিয়া বাঁচিয়া আছে। আজিকার দিনে মল্লিকার সহিত তাই গোলাপের বিবাহ দিতে চাই। তাহাদের বড় দুঃখ। উৎসবের দিনে দুঃখীরাই যদি সুখ না পাইল, তবে কিসের উৎসব? শহরের যত আলো ও যত বাজনা আছে সমস্ত একদিনের জন্য ভাড়া করিয়া, একটি মল্লিকার সহিত একটি গোলাপের বিবাহ দিয়া আজিকার উৎসব সার্থক করিতে চাই। কিছু অর্থ সংগ্রহ করিয়া দিতে পারেন?

আমার মুখে কথা সরিতেছিল না।

পরস্পরের দিকে চাহিয়া উভয়েই কিছুক্ষণ নির্ব্বাক হইয়া রহিলাম। বাক্যস্ফূর্ত্তি হইলে প্রশ্ন করিলাম, ভোজ দিবেন কি বিবাহ উপলক্ষেই?

ব্রাহ্মণ বলিলেন, না। বিড়াল-ভোজন করাইব।

বিড়াল-ভোজন?

হাঁ, বিড়াল-ভোজন। বিড়ালদেরও আজকাল বড় দুঃখের দিন আসিয়াছে। তাহাদের সকরুণ মেও মেও ধ্বনি কি শুনিতে পান না? শুনিতে পান না কি—তাহারা দিবারাত্রি বলিতেছে, "আমাদের দশা দেখ! আহারাভাবে উদর কৃশ, অস্থি পরিদৃশ্যমান, লাঙ্গুল বিনত, দাঁত বাহির হইয়াছে, জিহ্বা ঝুলিয়া পড়িয়াছে—অবিরত

আহারাভাবে ডাকিতেছি, মেও! মেও! খাইতে পাই না। আমাদের কালো চামড়া দেখিয়া ঘৃণা করিও না! এ পৃথিবীর মৎস্যে মাংসে আমাদের কিছু অধিকার আছে। খাইতে দাও—নহিলে চুরি করিব। আমাদের কৃষ্ণ চর্ম্ম, শুষ্ক মুখ, ক্ষীণ সকরুণ মেও মেও শুনিয়া তোমাদিগের কি দুঃখ হয় না? চোরের দণ্ড আছে, নির্দ্দয়তার কি দণ্ড নাই? দরিদ্রের আহার সংগ্রহের দণ্ড আছে, ধনীর কার্পণ্যের দণ্ড নাই কেন?···পাঁচ শত দরিদ্রকে বঞ্চিত করিয়া এক জনে পাঁচ শত লোকের আহার্য্য সংগ্রহ করিবে কেন? যদি করিল, তবে সে তাহার খাইয়া যাহা বাহিয়া পড়ে, তাহা দরিদ্রকে দিবে না কেন? যদি না দেয়, তবে দরিদ্র অবশ্য তাহার নিকট হইতে চুরি করিবে; কেন না, অনাহারে মরিয়া যাইবার জন্য এ পৃথিবীতে কেহ আইসে নাই।” বুভুক্ষু বিড়ালদের এ ক্রন্দন শুনিতে পান না কি? দরিদ্র অনাহারক্লিষ্ট বিড়ালদের সংখ্যা আজকাল খুব বাড়িয়াছে। আজিকার এই উৎসবের দিনে—অন্তত একটা দিনের জন্যও—প্রাণ ভরিয়া তাহাদের খাওয়াইতে চাই। কিন্তু আমি নিঃস্ব ব্রাহ্মণ। আপনারা যদি অর্থসাহায্য করেন, তবেই আমার বাসনা চরিতার্থ হয়। আজ আপনারা সকলে হুজুগে মাতিয়াছেন, সেইজন্য ভরসা হইতেছে যে, উপযুক্ত স্থানে নিবেদন করিলে হয়তো আমার আশা ফলবতী হইতে পারে। কারণ হুজুকে না মাতিলে বাঙ্গালী কিছুই করে না। আমার আর কিছুই বক্তব্য নাই। কিছু সাহায্য করিবেন কি?

বলিলাম, আপনার প্রস্তাব খুবই উত্তম। কিন্তু আমার একার সাধ্যে কুলাইবে না। বন্ধুবান্ধবদের নিকট চেষ্টা করিয়া দেখি, যদি প্রসংহ করিতে পারি।

ব্রাহ্মণ উঠিয়া পড়িলেন।

ভাল কথা, আমিও আরও কয়েক স্থানে চেষ্টা করিয়া দেখি।—এই বলিয়া তিনি গমনোন্মুখ হইলেন।

প্রশ্ন না করিয়া পারিলাম না, আপনার নামটা জানিতে পারি কি?

শ্রীকমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী।

পরমুহূর্ত্তেই দ্বারপথে তিনি নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেলেন।

আমি বিমূঢ়ের মত বসিয়া রহিলাম।

দড়াম করিয়া শব্দ হওয়াতে চমকাইয়া উঠিলাম।

জানালাটা সশব্দে খুলিয়া গেল।

বাতায়ন-পথে দেখিলাম, আষাঢ়-গগনে মহিমাময় মেঘসমারোহ। বিদ্যুৎ স্ফুরিত হইতেছে। খরবেগে বাতাস বহিতেছে। ঠিক একশত বৎসর পূর্ব্বে আষাঢ় মাসের এমনই এক রজনীতে বঙ্কিমচন্দ্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার জীবনচরিতকার লিখিতেছেন—সেদিন আকাশ নির্ম্মল ছিল। ছিল কি?

ডাক্তার আসিয়া প্রবেশ করিলেন।

আমার যে কলিক হইয়াছিল তাহা ভুলিয়াই গিয়াছিলাম।

ডাক্তারবাবু প্রশ্ন করিলেন, ইন্‌জেক্‌শন দেওয়ার পর ঘুম হয়েছিল?

না, ঘুম হয় নি। তবে ব্যথাটা আর নেই।

মর্ফিয়া নিয়েও ঘুম হ'ল না আপনার? আশ্চর্য্য তো! আচ্ছা, এই ওষুধটা খাবেন তা হ'লে।

প্রেস্‌ক্রিপ্‌শন লিখিয়া দিয়া তিনি চলিয়া গেলেন।

মর্ফিয়া!

তীক্ষ্ণসূচিমুখে কমলাকান্তের প্রেতাত্মা শরীরে প্রবেশ করিয়াছেন বুঝিলাম।

একটু পরে নাতি আসিলেন।

খান তুই বাঁধানো বই আমার হস্তে দিয়া বলিলেন, এখানকার লাইব্রেরীতে বঙ্কিমবাবুর গ্রন্থাবলী সব নেই। অনেক খোঁজাখুঁজি ক'রে এইগুলো পেলুম। প্রবন্ধগুলো একেবারে নেই।

আমি এককালে বঙ্কিমচন্দ্রের সমস্ত পুস্তকই খরিদ করিয়াছিলাম। কে কোথায় লইয়া গিয়াছে, বাড়ীতে এখন একখানাও নাই। নাতিকে সেজন্য স্থানীয় পাঠাগারে পাঠাইয়াছিলাম।

নাতিকে জিজ্ঞাসা করিলাম, ভূতে বিশ্বাস করিস?

হঠাৎ ভূতের কথা কেন?

বল না, করিস কি না?

নিশ্চয়ই না।

সেইজন্যেই তোদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার।

একটু হাসিয়া নাতি ভিতরে চলিয়া গেল।

বসুমতী-সংস্করণের কীটদষ্ট পীতাভ পাতাগুলি উল্টাইতে লাগিলাম। আশ্চর্য্য, মাত্র একশত বৎসর আগে বঙ্কিমচন্দ্র এই দেশের মাটিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন! অথচ—

শুইয়া শুইয়া 'কমলাকান্তের দপ্তর' পড়িতেছিলাম।

"সহসা আকাশ অন্ধকারে ব্যাপিল, রাজপ্রাসাদের চূড়া ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল। পথিক ভীত হইয়া পথ ছাড়িল ; নাগরীর অলঙ্কার খসিয়া পড়িল ; কুঞ্জবনে পক্ষিগণ নীরব হইল, গৃহময়ূরকণ্ঠে অর্দ্ধব্যক্ত কেকার অপরার্দ্ধ আর ফুটিল না। দিবসে নিশীথ উপস্থিত হইল,

পণ্যবীথিকায় দীপমালা নিবিয়া গেল, পূজাগৃহে বাজাইবার সময় শঙ্খ বাজিল না; পণ্ডিতে অশুদ্ধ মন্ত্র পড়িল; সিংহাসন হইতে শালগ্রাম-শিলা গড়াইয়া পড়িল। যুবার সহসা বলক্ষয় হইল; যুবতী সহসা বৈধব্য আশঙ্কা করিয়া কাঁদিল; শিশু বিনা রোগে মাতার ক্রোড়ে শুইয়া মরিল! গাঢ়তর, গাঢ়তর, গাঢ়তর অন্ধকারে দিক ব্যাপিল। আকাশ, অট্টালিকা, রাজধানী, রাজবর্ত্ম, দেব মন্দির, পণ্যবীথিকা সেই অন্ধকারে ঢাকিল—কুঞ্জতীরভূমি, নদীসৈকত, নদীতরঙ্গ সেই অন্ধকারে—আঁধার, আঁধার, আঁধার...”

পড়িতে পড়িতে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম।

স্বপ্নে আবার কমলাকান্ত আসিয়া দেখা দিলেন। তাঁহার উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি, হতাশাব্যঞ্জক কণ্ঠস্বর। বলিলেন, আমার অত টাকার আর প্রয়োজন নাই। কোন রকমে গয়ার ভাড়াটা জোগাড় করিয়া দিতে পারেন?

কেন?

পিণ্ড দিব।

সেকি! কাহার?

সকলের। খোঁজ করিয়া দেখিলাম, কেহ বাঁচিয়া নাই।

ঘুম ভাঙিয়া গেল।

বাতায়ন-পথে চাহিয়া দেখিলাম, ঘনকৃষ্ণ মেঘের স্তর ভেদ করিয়া বঙ্কিম-চন্দ্র উদিত হইতেছেন। আর্দ্র-ধরণী জ্যোৎস্না-সম্পাতে সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। পত্রে পত্রে, তৃণে তৃণে, তরঙ্গে তরঙ্গে, সৌধশীর্ষে, কুটীর-প্রাঙ্গণে আলোকের জয়ধ্বনি শুনিতে পাইলাম।

“আমি আছি। সমস্ত মেঘ সত্ত্বেও আমি আছি।”

কে এ কথা বলিল ?

আকাশবিহারী বঙ্কিম-চন্দ্রের প্রতি চাহিয়া দেখিলাল, নিঃশব্দে অট্টহাস্য করিতেছেন।

অদ্ভুত অট্টহাস্য !

দেখিলাম, নিরুদ্ধ হাস্যবেগে তাঁহার চক্ষু হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইতেছে। দেখিতে দেখিতে রজতসন্নিভ ধবলকান্তি রক্তবর্ণ ধারণ করিল। ঘনকৃষ্ণ মেঘস্তূপে আগুন লাগিয়াছে।

সবিস্ময়ে চাহিয়া দেখিলাম, এ তো চন্দ্র নহে—এ যে সূর্য্য !

অন্ধকার সরিয়া যাইতেছে।

সভয়ে মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া প্রণাম করিলাম—

ওঁ জবাকুসুমসঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম্
ধ্বান্তারিং সর্ব্বপাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরম্।

* * * *

ঠিক করিয়াছি, আফিং ধরিব।

বিবেক

এক

দেখিতেছি এবং শুনিতেছি। চক্ষু কর্ণ এখনও বিকল হয় নাই। সুতরাং অনেক রকম দেখিতে ও শুনিতে হইতেছে। এই সকল দর্শন-শ্রবণের ফলে যাহা ঘটিতেছে, তাহাকে অঘটন আখ্যা দেওয়াই সঙ্গত। অঘটন ঘটিতেছে, কারণ শুধু চক্ষু কর্ণ নহে, রসনা এবং দক্ষিণ হস্তখানিও এখনও সক্রিয় আছে। কিন্তু রসনা ও দক্ষিণ হস্তের উত্তেজনামূলক ক্রিয়াকলাপ দেখিয়া ধর্ম্মবুদ্ধিসম্পন্ন বিবেক চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। কারণ শুধু চক্ষু কর্ণ রসনা এবং হস্ত নহে, বিবেক নামক বস্তুটিও এখনও রীতিমত জাগ্রত রহিয়াছে। মুস্কিলে পড়িয়াছি।

সেদিন চক্ষু বলিল, দেখ দেখ, রামের গাছ হইতে শ্যাম জোর করিয়া আম পাড়িয়া লইয়া সরিয়া পড়িতেছে।

কর্ণ বলিল, শুধু তাহাই নহে, ওই শুন শ্যাম নিজেকে সুদক্ষ বীর বলিয়া ঘোষণা করিতেছে, এবং শ্যাম বড়লোক বলিয়া সকলে তাহার পক্ষাবলম্বন করিয়া জয়ধ্বনি দিতেছে।

রসনা চুলবুল এবং হাত নিসপিস করিয়া উঠিল।

তর্জ্জনী আস্ফালন করিয়া বিবেক কহিল, খবরদার, কিছু বলিও না, বা করিও না। কেবল নীরবে দেখিয়া যাও এবং শুনিয়া যাও।

সবিনয়ে প্রশ্ন করিলাম, নিরপেক্ষ মতামত ব্যক্ত করিতে ক্ষতি কি?

বিবেক উত্তর দিল, মতামত কখনও নিরপেক্ষ হয় না। তোমার মতামত তোমার কাছে অথবা তোমার মত বুদ্ধি সম্পন্ন লোকের কাছে মূল্যবান হইতে পারে। কিন্তু পৃথিবী বৈচিত্র্যময়। পৃথিবীতে বিভিন্ন মতের এবং বিভিন্ন আদর্শের লোকের অসদ্ভাব নাই। তোমার মতামতের মানদণ্ডটি সাড়ম্বরে আস্ফালন করিলে তুমি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষচারী কতকগুলি শত্রু সৃজন করিবে মাত্র। পৃথিবীতে শত্রু সৃজন করা লাভজনক নহে। সুতরাং রসনা ও হস্ত সংযত করিয়া কেবল দেখিয়া ও শুনিয়া যাও। ইহাই হিতবাক্য।

বলিলাম, বহির্জগতের উত্তেজনা অথবা অবসাদে উত্তেজিত অথবা অবসন্ন হওয়া জীবমাত্রেরই প্রাণধর্ম্ম।

বিস্মৃত হইও না, তুমি সাধারণ জীব নহ—তুমি মনুষ্য। অর্থাৎ ?

অর্থাৎ বাহ্যিক আন্দোলনে খামকা বিচলিত হওয়া প্রকৃত মনুষ্যের পক্ষে অকর্ত্তব্য।

অবিচলিত পাষাণই কি তাহা হইলে মনুষ্যত্বের আদর্শ ?

কে বলিল পাষাণ বিচলিত হয় না ? যে গাণিতিক নিয়মানুসারে পাষাণের আপাতস্থৈর্য্য দৃষ্টিগোচর করিতেছ, সেই গাণিতিক নিয়মানুসারেই সেই পাষাণকেই অস্থির করা কিছুমাত্র অসম্ভব নহে। পাষাণের উপর ক্রিয়াশীল শক্তির তারতম্যের উপর তাহা নির্ভর করে। পাষাণ মনুষ্যত্বের আদর্শ নহে। স্বকীয় শক্তিবলে বিক্ষোভকারী শক্তির প্রতিরোধ করিয়া নির্ব্বিকার থাকাই বুদ্ধিমান মনুষ্যের কর্ত্তব্য।

নির্ব্বিকার থাকিয়া লাভ কি ?

লাভ ? আধিভৌতিক লাভ কিছু নাই। শান্তি পাইবে। মনুষ্যত্ববিশিষ্ট মনুষ্যের পক্ষে তাহাই পরম কাম্য।

আধিভৌতিক শরীর ধারণ করিয়া আধিভৌতিক পারিপার্শ্বিকের মধ্যে বাস করি। সুতরাং আধিভৌতিক লাভ ক্ষতি কি নিতান্ত অবহেলার বস্তু ?

অবহেলার বস্তু নহে, অশান্তিজনক। সেই জন্যই পরিত্যাজ্য।

পরিত্যাজ্য বস্তুমাত্রেই পরিত্যাগ করা সহজ নহে। আধিভৌতিক জগতের উত্তাপ ও শৈত্য পঞ্চেন্দ্রিয়কে অনুক্ষণ অভিভূত করিতেছে। সুতরাং বরফ এবং অগ্নির সাহায্য না লইলে চলিবে কেন ?

সাহায্য লও। কিন্তু প্রয়োজনমত এবং নির্ব্বিকারে।

অর্থাৎ ?

অর্থাৎ বরফ অথবা অগ্নি লইয়া আতিশয্য করিও না। সম্পূর্ণ মোহমুক্ত হইয়া প্রয়োজনমত তাহাদের সাহায্য লও। তাহাদের লইয়া উন্মত্ত হইয়া উঠিবার আবশ্যকতা নাই।

রামের প্রতি শ্যামের এই অত্যাচারের প্রতিবাদ করা আমার পক্ষে উচিত কি অনুচিত তাহা সরল বাংলায় ব্যক্ত কর।

চলিত বাংলায় বলিতে গেলে বলিতে হয়, চাপিয়া যাও !

কেন ?

রামের পক্ষ লইয়া শ্যামের বিরাগভাজন হওয়ার কোন অর্থ হয় না।

আমি ন্যায়ের পক্ষ লইতে চাই।

ন্যায়শাস্ত্র ভাল করিয়া অধ্যয়ন করিলে হৃদয়ঙ্গম করিবে, ন্যায়-অন্যায়ের স্বরূপ সম্যক নির্দ্ধারণ করা স্বল্পবুদ্ধিবিশিষ্ট মানবের পক্ষে অসম্ভব। উহা লইয়া অনর্থক মস্তিষ্ক আলোড়িত করিও না। স্বকীয় চরকায় নির্ব্বিকারভাবে তৈলনিষেক করত শান্তিতে থাকিবার চেষ্টা কর। রাম-শ্যামের মামলার নিষ্পত্তি তাহারা নিজেরাই করুক। ইহা লইয়া তোমার উত্তেজিত হইবার প্রয়োজন দেখি না।

প্রয়োজন নাই বুঝিলাম। কিন্তু আমি যে উত্তেজিত হইয়া পড়িয়াছি। এখন উপায় কি?

প্রশমিত হও।

বেখাপ্পা বিবেকের সহিত আর বিতণ্ডা করিতে প্রবৃত্তি হইল না। ছাতা ঘাড়ে করিয়া বাহির হইয়া পড়িলাম। এই জন্যই বোধ হয় সাধারণ মানুষ একা থাকিতে পারে না। একা থাকিলেই বিবেকের সহিত মুখামুখি হইতে হয় এবং তাহা প্রায়ই সাংঘাতিক ব্যাপার। কারণ সাংসারী পাপী তাপী মানুষের বিবেক দংশনোন্মুখ, এবং তাহার দংষ্ট্রা বড় তীক্ষ্ণ। এই জন্যই বোধ হয় অধিকাংশ লোক কাজে কর্ম্মে আড্ডায় গল্পে গুজবে নিজেকে ব্যাপৃত রাখিয়া নিজের বিবেকের নিকট হইতে আত্মরক্ষা করে। একা থাকিলে বিবেক খুন করিয়া ফেলিবে।

রাম-শ্যাম ঘটিত গল্পটি নিম্নলিখিত প্রকার।

রামবাবু আমাদের পাড়ার লোক। বেচারি ছাপোষা গরীব গৃহস্থ। কিন্তু তাঁহার আমগাছটির এ অঞ্চলে নাম আছে। বড় বড় আম, সুমিষ্ট, আঁশ নাই, অথচ পেটভার করে না। রামবাবু প্রতি বৎসর আমগুলি বিক্রয় করিয়া থাকেন, এবং প্রতি বৎসর আমিই সেগুলি কিনিয়া থাকি। এবার শ্যামবাবুও ক্রেতারূপে আবির্ভূত হইলেন। শ্যামবাবুর প্রস্তাবিত মূল্য কিন্তু রামবাবুর মনঃপূত হইল না, এবং তিনি শ্যামবাবুকে আম্র বিক্রয় করিতে অসম্মত হইলেন। আমি ভাবিলাম, তাহা হইলে এ বৎসরও আমি আম্রগুলি পাইতে পারিব। কিন্তু অকস্মাৎ শ্যামবাবু পাঁচ জন বরকন্দাজ পাঠাইয়া দিবা-দ্বিপ্রহরে রামবাবুর সমস্ত আমগুলি পাড়াইয়া লইয়া গেলেন। শোনা কথা নয়, আমি স্বচক্ষে দেখিলাম। দরিদ্র

রামবাবুর বিপন্ন মুখচ্ছবি চোখের সম্মুখে ভাসিতেছে। ভীমদর্শন বরকন্দাজগুলার সগুম্ফ হুমকিও দেখিতে পাইতেছি। নাঃ ইহার একটা বিহিত করিতেই হইবে।

পথে যাইতে যাইতে প্রবীণ দিগম্বর সিঙ্গির সহিত দেখা হইল। তাঁহাকে আদ্যোপান্ত সমস্ত খুলিয়া বলিলাম।

শুনিয়া তিনি মৃদু হাসিলেন, কপালে তর্জ্জনী ঠেকাইলেন এবং সর্ব্বশেষে হাত দুইটি উল্টাইয়া আকাশের দিকে চক্ষু দুইটি তুলিলেন। সিঙ্গি মহাশয় স্বল্পভাষী লোক। তাঁহার বক্তব্য সাধারণতঃ তিনি ইঙ্গিত দ্বারাই ব্যক্ত করিয়া থাকেন। উপরোক্ত ইঙ্গিতগুলির দ্বারা তিনি ঠিক কি ব্যক্ত করিলেন তাহা সম্যক প্রকারে না বুঝিলেও, রামবাবুর প্রতি তিনি যে সহানুভূতিসম্পন্ন হইয়াছেন তাহা বুঝিলাম। আর একটু গিয়াই ভট্টাচার্য্যের দর্শন পাইলাম। ভট্টাচার্য্য মহাশয় গ্রামের গেজেট। আমাকে দেখিয়াই বলিলেন, শুনেছ ভায়া, মাগী সরেছে! আগেই বলেছিলাম, ও চিঁড়িয়া উড়বে—

প্রশ্ন করিলাম, কোন্ মাগী?

তুমি যে আকাশ থেকে পড়লে হে! ওই তোমাদের মিস্ট্রেস—বালিকা-বিদ্যালয়ের বিদ্যেধরী—এখন নো ট্রেস! শাড়ির চটক দেখেই বুঝেছিলাম আগেই—

রাম-শ্যাম-সংবাদটিও ভট্টাচার্য্যের কর্ণগোচর করিলাম। ভট্টাচার্য্য বলিলেন, শ্যাম যে ওরকম করবে তার আর বিচিত্র কি, মুখখানা দেখনি ওর? ব্যাটা যেন রাঘব বোয়াল! রামবাবুকে বল, ঠুকে দিক এক নম্বর। হেবোকে বললেই সে সব ঠিক ক'রে দেবে। এ মগের মুলুক নয়, ইংরেজ রাজত্ব, ট্যাঁ ফোঁ চলবে না, হেঁ হেঁ, হেবোকে পাকড়াও গিয়ে।

প্রতিশ্রুতি দিলাম, প্রয়োজন হইলে সদ্য-পাশ-করা উকিল ভট্টাচার্য্য-তনয় হাবুলেরই শরণাপন্ন হইতে রামবাবুকে প্ররোচিত করিব। ভট্টাচার্য্য উৎসাহ দিয়া চলিয়া গেলেন।

ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের পর যথাক্রমে চানি ঘোষাল, সতু ঘোষ, হীরু মিত্তির, বীরু মুখুয্যে, কাতু সরকার এবং ফড়িং মামার সহিত সাক্ষাৎকার ঘটিল, এবং সকলের নিকটেই শ্যামবাবুর অমানুষিক অত্যাচারের কথা যথাশক্তি নিবেদন করিলাম। সকলেই নিজস্ব ধরণে সহানুভূতি জ্ঞাপন করিলেন।

হাঁটিতে হাঁটিতে থানার নিকটবর্ত্তী হইয়াছিলাম। দারোগাবাবুর সহিত স্বল্প চেনাশোনাও ছিল। কিছুক্ষণ বসিয়া তাঁহার সহিতও এ বিষয়ে আলাপ করিলাম। তিনি দৃঢ়ভাবে বলিলেন যে, আইন কাহারও খাতির করে না। রামবাবু যদি নালিশ করেন, এবং শ্যামবাবু যদি দোষী সাব্যস্ত হন, নিশ্চয়ই তাঁহার সাজা হইয়া যাইবে। ধনী বলিয়াই তিনি নিষ্কৃতি পাইবেন না।

অনেকটা আশ্বস্ত হইয়া বাড়ি ফিরিয়া আসিলাম।

দুই

উপরোক্ত ঘটনার পর এক মাস অতীত হইয়াছে।

এই ঘটনা সম্পর্কে নিম্নলিখিত সংক্ষিপ্ত সংবাদগুলি প্রণিধানযোগ্য। বিনা মেঘে বজ্রপাত কথাটা নিতান্ত বাজে কথা নয়।

১। রামবাবুর সহিত শ্যামবাবুর হরিহর-আত্মা-জাতীয় মিলন সংঘটিত হইয়াছে।

২। পাঁচ হাজার টাকার দাবি করিয়া শ্যামবাবু আমার নামে মানহানির মকোর্দ্দমা দায়ের করিবেন বলিয়া উকিলের চিঠি দিয়াছেন। হাবুলই উকিল।

৩। দিগম্বর সিঙ্গি, ভট্টাচার্য্য মহাশয়, চানি ঘোষাল, সতু ঘোষ, হীরু মিত্তির, বীরু মুখুজ্জে, কাতু সরকার, ফড়িং মামা এবং থানার দারোগা সত্যনিষ্ঠার খাতিরেই সম্ভবত আমার বিরুদ্ধে সাক্ষী দিবেন বলিয়া কৃতনিশ্চয় হইয়াছেন। ইঙ্গিতপ্রবণ দিগম্বরই প্রধান সাক্ষী শুনিতেছি। রামবাবুও শুনিলাম বলিয়া বেড়াইতেছেন যে, তিনি স্বেচ্ছায় সুস্থ-মস্তিষ্কে তাঁহার গাছের আম শ্যামবাবুকে বিক্রয় করিয়া টাকা লইয়াছেন এবং রসিদ লিখিয়া দিয়াছেন।

পাঁচ হাজার টাকা আমার নাই। সুতরাং জেল অনিবার্য্য।

তিন

হিতৈষী প্রতিবেশী চৌধুরী মহাশয় এইমাত্র বলিয়া গেলেন যে, আমি গিয়া শ্যামবাবুর নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা করিলেই সমস্ত ব্যাপার অবিলম্বে মিটিয়া যাইবে। কারণ তাঁহার মতে শ্যামবাবু লোকটি একটু রগ-চটা হইলেও দিল-দরিয়া। কি করিব ভাবিতেছি, এমন সময়ে কঠোর-কণ্ঠে বিবেক কহিল, ক্ষমাপ্রার্থনা করিও না।

কেন ?

শান্তিই মনুষ্যের কাম্য। এ অবস্থায় জেলের ভিতরেই তুমি অধিক শান্তি পাইবে। ন্যায়ের মর্য্যাদা রক্ষার জন্য কিছুদিন কারাবরণ করিলে তোমার কিছুমাত্র অমর্য্যাদা হইবে না।

কিছুক্ষণ থামিয়া পুনরায় বলিল, এবং কিছু শিক্ষাও হইবে।

এমন সময় আর একটি বজ্র পড়িল। এটিও বিনা মেঘে।

প্রিয়বন্ধু প্রাণকান্ত আসিয়া প্রবেশ করিলেন এবং বলিলেন, আমার সময় কম, মাছ ধরিতে যাইতেছি। কেবল একটি সু-খবর দিতে আসিয়াছি। জজ সাহেব বদলি হইয়াছেন, এবং তাঁহার স্থানে যিনি আসিতেছেন, তিনি আমার প্রিয়তমা শ্যালিকার পাণিপীড়ক, অর্থাৎ আমার ভায়রাভাই। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবও বদলি হইয়াছেন এবং তাঁহার স্থানেও সৌভাগ্যক্রমে যিনি আসিতেছেন, তিনি আমার বাল্যবন্ধু। সুতরাং চল, এই সুযোগে শ্যামবাবুকে একদিন চাবকাইয়া আসা যাক। আমার নিকট খুব ভাল একটা হাণ্টার আছে।

মুচকি হাসিয়া প্রাণকান্ত চলিয়া গেলেন।

চার

দামী কার্ডখানা হাতে লইয়া বসিয়া আছি। ইহাতে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত রহিয়াছে যে, শ্যামসুন্দর দে অত্যন্ত বাধিত হইবেন, যদি আমি অদ্য সন্ধ্যায় তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্রের নামকরণ উপলক্ষে অনুষ্ঠিত উদ্যান-উৎসবে যোগদান করি। ইংরেজীটুকুর অনুবাদ করিলে ইহাই অর্থ হয়। যিনি কার্ডটা দিয়া গেলেন, তিনি ইহাও বলিয়া গেলেন যে, নবাগত জজ এবং ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবও নিমন্ত্রিত হইয়াছেন। প্রাণকান্তও।

একটু পরে প্রাণকান্ত আসিলেন। বলিলেন, আর ঝগড়াঝাঁটি করিয়া কাজ নাই। মধুরেণ সমাপয়েৎ করাই ভাল। পরে

প্রয়োজন হইলে হাণ্টার তো আছেই। এখন ভোজটা ছাড়ি কেন?

পাঁচ

ভূরিভোজনের পরে যখন ফিরিলাম, তখন রাত্রি অনেক। আসিয়াই ঘুমাইয়া পড়িলাম। ঘুমাইয়া স্বপ্ন দেখিলাম। অদ্ভুত স্বপ্ন।

একটা ভীষণদর্শন বলিষ্ঠ লোক কি যেন খুঁজিয়া বেড়াইতেছে। তাহার হাতে প্রকাণ্ড একটা কলসী। প্রশ্ন করিলাম, কি খুঁজিতেছেন?

আমার প্রতি অগ্নিদৃষ্টি হানিয়া সে বলিল, দড়ি।

দড়ি? আপনি কে?

তোমার বিবেক, রাস্কেল!
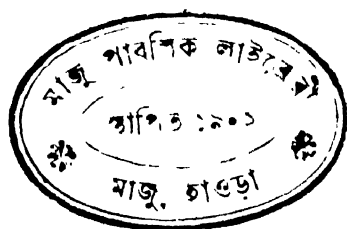
বিবর্ত্তন

প্রত্যেক জিনিসই তলাইয়া দেখা উচিত—ইহাই জ্ঞানীগণের পরামর্শ। কিন্তু মুস্কিল এই যে, প্রত্যেক জিনিসই অতলস্পর্শী। কোন কিছুরই তল খুঁজিয়া পাওয়া অসম্ভব। সামান্য ধূলিকণারও সম্পূর্ণ রূপ, সম্পূর্ণ ইতিহাস, সম্পূর্ণ রহস্য সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করিতে পারি, এমন সম্পূর্ণ বুদ্ধি আমাদের শিরোভাণ্ডে নাই। যতটুকু আছে ততটুকু লইয়া কেবল দিশাহারা হইয়া পড়া ছাড়া আর কিছুই করা যায় না। মাঝে মাঝে মনে হয়, এই যৎসামান্য মস্তিষ্ক না থাকিলেই যেন ভাল হইত। নির্ব্বিকারভাবে খরস্রোতের টানে অনন্ত কাল ভাসিয়া যাইতাম, অথবা যেখানে ঠেকিবার ঠেকিয়া থাকিতাম। অনিবার্য্য খরস্রোতের টানে ভাসিয়াই তো চলিয়াছি; এই দুর্নিবার স্রোতের প্রতিরোধ করি, এমন শক্তি তো নাই। কিন্তু কিছুতেই নির্ব্বিকার থাকিতে পারিতেছি না। অত্যল্প বুদ্ধি-প্রভাবে উচ্চিঙ্গড়ার মত ক্রমাগত তড়পাইতেছি। ‘এটা কর’ ‘ওটা কর’ ‘এটা করিলে ভাল হইত’ ‘আহা, এ কথাটা যদি আগে ভাবিতাম’ প্রভৃতি নানারূপ ক্ষুদ্র বৃহৎ বিক্ষোভ চিত্তকে আলোড়িত করিতেছে। অনতিদূরপ্রসারী জ্ঞানের প্ররোচনায় পড়িয়া জলকে সোজাসুজি জল ভাবিয়া তৃপ্তি পাইতেছি না। জলের মধ্যে হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, তাহাদের মধ্যে মলিকিউল, অ্যাটম, ইলেকট্রন, তন্মধ্যে বৈদ্যুতিক লীলা এবং তাহারও পশ্চাতে একটা অজ্ঞাত শক্তির আভাস পাইয়া বিব্রত হইয়া উঠিতেছি। ইহাই হয়তো বিজ্ঞান এবং সর্পের মধ্যে ব্রহ্মের অস্তিত্ব অথবা ব্রহ্মের মধ্যে সর্পের সম্ভাবনা

আবিষ্কার করা হয়তো সূক্ষ্ম বুদ্ধি, কিন্তু এই বিজ্ঞান ও সূক্ষ্ম বুদ্ধি লইযা আমরা ডুবিতে বসিয়াছি। সত্য-মিথ্যার এমন একটা জট পাকাইয়া গিয়াছে যে, কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইযা বসিয়া থাকা ছাড়া আর গত্যন্তব নাই। কিন্তু কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইযা বসিয়া থাকিবার মত মানসিক শক্তিও তো নাই। সমস্ত জিনিসটা তলাইয়া দেখিবার অদম্য বাসনা এবং নিজের বুদ্ধিশক্তি সম্বন্ধে অকথ্য অহঙ্কার—এই দুই প্রস্তরখণ্ড স্কন্ধে বাঁধিযা আমরা জীবন-প্রবাহে স্বচ্ছন্দে ভাসিতে পারিতেছি না। সহজ গতি নষ্ট হইয়া গিয়াছে। ভাবিতেও পারিতেছি না, এক্ষেত্রে আমার কি বক্তব্য বা কর্ত্তব্য। নরোত্তম নামক যুবকটির সম্বন্ধে আমার ধারণা ক্রমাগত পরিবর্ত্তন [illegible] তো কোন কুল-কিনারা পাইতেছি না। মনে হইতেছে, নরোত্তম নামক যুবকটির আরও না জানি কত প্রচ্ছন্ন রূপ আছে। অপ্রত্যাশিতপূর্ব্ব ইহারই নাম কি বিবর্ত্তন ?

নরোত্তমকে হিন্দুবংশাবতংস বলিয়াই জানিতাম।

যখন সে সসম্মানে বিশ্ববিদ্যালয়েব শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইল তখন স্বীকার কবিতে বাধা রহিল না যে, ছেলেটি বিদ্যানুরাগীও। তাহার বিদ্যাবত্তার পরিচযে পুলকিত হইলাম। এবং তাহার দীর্ঘ জীবন কামনা করিলাম। দীর্ঘ জীবন হযতো সে লাভ করিবে, কিন্তু আমার পুলক বেশিক্ষণ টিকিল না। তাহার বিদ্যানুরাগ সম্বন্ধে ধারণাটি [illegible] যখন সানন্দে দৃঢ় করিয়া আনিতেছিলাম, তখন সহসা নরোত্তম এমন একটি কাণ্ড করিয়া বসিল যে, তাহার বিদ্যানুরাগ সম্বন্ধে ধারণা এবং তজ্জনিত আনন্দ যুগপৎ আমার মন হইতে বিলুপ্ত হইল। দেখিলাম, নরোত্তম দাস খদ্দর ধারণ করিয়া স্কুল-কলেজ-বর্জ্জন-অভিযানে

উদ্যত-প্রহরণ হইয়াছেন। প্রহরণটি অবশ্য সাংঘাতিক কিছু নয়, নরোত্তমেরই অহিংস রসনা। কিন্তু তাহার অহিংস রসনাটিতেই এমন সহিংস বাণীমূর্ত্তি বাঙ্ময় হইয়া উঠিল যে, আমরা অভিভূত হইয়া পড়িলাম। বিদ্যালয়গমনোন্মুখ বালকবালিকাদলকে ঘর্ম্মাক্ত-কলেবরে হস্তপদ আস্ফালন করিয়া অহিংসভাবে নরোত্তম ইহাই বুঝাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল যে, বর্ত্তমান অবস্থায় লেখাপড়া শিখিবার প্রয়াস কেবল যে হাস্যকর এবং অনর্থক তাহাই নহে— মহাপাপ। মৃতপ্রায় দেশমাতার কণ্ঠনালীতে যেটুকু প্রাণ ধুকধুক করিতেছে, চরকা না ঘুরাইয়া লেখাপড়া শিখিতে গেলে সেটুকুও অবিলম্বে বাহির হইয়া যাইবে। দলে দলে বালকবালিকা যুবক-যুবতী স্কুল কলেজ পরিত্যাগ করিয়া বিদেশী কাপড় পুড়াইতে ও চরকা ঘুরাইতে প্রবুদ্ধ হইল। সকলেই দেখিলাম, ধৃতখদ্দর গান্ধী-টুপি-পরিহিত নরোত্তমের বিশুদ্ধ স্বদেশীয় প্রতিভার নবারুণচ্ছটায় বিদ্যানুরাগী কোমলস্বভাব নরোত্তমচন্দ্র ম্রিয়মাণ হইযা লজ্জায় আত্ম-গোপন করিতেছে। আমিও নবোত্তম সম্বন্ধে আমার ধারণাটি পরিবর্ত্তন করিয়া স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলাম। কিন্তু বেশি দিন নয়, আবার নিশ্বাস টানিয়া রুদ্ধশ্বাস হইতে হইল। বহু বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তি দৃঢভাবে বলিতে লাগিলেন যে, নবোত্তম গোপনে মদ্যপান কবিতেছে। সুতরাং তাহার সম্বন্ধে পুনরায় ধারণা পরিবর্ত্তন করিবার সঙ্গত কারণ ঘটিল। একদিন সন্দেহ হইল, আমার বোতল হইতেও সে কিঞ্চিৎ সুরা অপহরণ করিয়াছে। অনিবার্য্য-ভাবে তাহার সম্বন্ধে ধারণা যদিও পরিবর্ত্তিত হইল, কিন্তু মুগ্ধ হইয়া গেলাম। তাহার এই সর্ব্বদিক-রক্ষাকারী প্রতিভার অসামান্যতা মনকে প্রবলভাবে নাড়া দিল। নিজের বোতলটি সাবধানে রক্ষা

করিয়া মুগ্ধ বিস্ময়ে তাহার গতিবিধি লক্ষ্য করিতে লাগিলাম। না লক্ষ্য করিলেই ভাল করিতাম। কারণ লক্ষ্য করিতে গিয়া বিস্ময় কাটিয়া গেল এবং মুগ্ধ ভাবটাও টিকিল না। একদিন শুনিলাম, গভীর রাত্রে সকলে তাহাকে ধরাধরি করিয়া বাড়ি পৌঁছাইয়া দিয়াছে, মুক্তকচ্ছ হইয়া নৰ্দ্দমায় নাকি পড়িয়া ছিল। মনে ব্যথা পাইলাম, কিন্তু আবার ধারণা পরিবর্ত্তিত করিতে হইল। যাহাকে শ্যাম-এবং-কুল-বজায়কারী নীতিকুশল ভাবিয়াছিলাম, সক্ষোভে স্বীকার করিতেই হইল যে, সে নিতান্ত সাধারণ মদ্যপ। ইহার পর সহসা সে ডুব মারিল। কোথায় এবং কি কারণে তাহা জানিতে পারিলাম না। সুতরাং তাহার সম্বন্ধে শেষ ধারণাটাই মনের মধ্যে বনিয়াদী হইতেছিল। এমন সময়ে একদিন প্রাতঃকালে নূর ও ফেজক্যাপধারী নরোত্তম আসিয়া আমাকে আদাব করিল এবং বার দুই পিচ ফেলিয়া বলিল যে, সে মুসলমানধৰ্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে।

বর্ত্তমানে তাহার নাম নরোত্তম নয় নুরুদ্দিন। সম্ভবত আমার নয়নের দৃষ্টিতে বিস্ময় ফুটিয়া উঠিয়াছিল, তাই সে একটু মৃদু হাসিল এবং নূরে বার দুই হাত বুলাইয়া সবিনয়ে বলিল, যদি অনুমতি করেন, সমস্ত খুলিয়া বলি।

অনুমতি করিলাম।

সে বলিতে লাগিল, দেখুন অনেক চিন্তা করিয়াই আমি এ কার্য্য করিয়াছি। আমি নিতান্ত মূর্খ নই এবং জীবনের নানাপ্রকার অভিজ্ঞতাও আমার হইয়াছে। সুতরাং যাহা করিয়াছি, তাহা হঠকারিতা নহে—অনেক চিন্তার ফল। যাঁহারা প্রকৃত জ্ঞানী, তাঁহারা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেন যে, সকল ধৰ্ম্মই মূলত

এক। আমিও তাহা স্বীকার করি এবং আশা করি আপনিও করেন। কিন্তু মুস্কিল হইয়াছে এই যে, রাজনীতিক্ষেত্রে এই জ্ঞান-গর্ভ সত্যটি স্বীকৃত হইতেছে না। শুধু তাহাই নয়, বর্ত্তমানে রাজনীতিক্ষেত্রে একটি ধর্ম্মকে প্রশ্রয় দিয়া অন্য এক ধর্ম্মকে নির্য্যাতিত করাই প্রচলিত রীতি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এ কথা আশা করি আপনার অবিদিত নাই যে, আজকাল বাঙালী হিন্দু বলিয়াই বিশেষ করিয়া বিপন্ন, সকলেই মুসলমানের পৃষ্ঠপোষকতা করিতেছেন! এ অবস্থা যে মোটেই শান্তিজনক নহে চাকুরি অনুসন্ধান করিতে গিয়া আমি তাহা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিয়াছি। নরোত্তমরূপে আমার সকল চেষ্টাই নিষ্ফল হইতেছিল, কিন্তু নুরুদ্দিন হইবামাত্রই আমার চেষ্টা ফলবতী হইয়াছে। সকল ধর্ম্মই যদি মূলত এক হয় ধর্ম্মান্তর গ্রহণের কোনরূপ নৈতিক বাধা নাই; অথচ রাজনৈতিক সুবিধা রহিয়াছে। আমার মনে হয়, আর কিছুর জন্য না হউক, রাজনৈতিক চাল হিসাবেই এখন সকলের দলবদ্ধভাবে মুসলমান হইয়া যাওয়া কর্ত্তব্য। হিন্দু-মুসলমান-সমস্যা-সমাধানের ইহাই একমাত্র উপায়। আপনি হয়তো বলিবেন, মুসলমানেরাই হিন্দু হউক না কেন! তদুত্তরে আমি বলিব যে, মুসলমানেরা আমাদের অবুঝ ভাই, তাহারা এ যুক্তি কিছুতেই বুঝিবে না। তাহা ছাড়া, যে পরিমাণ মানসিক বিস্তার থাকিলে অনায়াসে ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করা যায়, সে পরিমাণ ঔদার্য্য যে কোন কারণেই হউক মুসলমানদের সম্প্রতি নাই। মুসলমানদের নাই, কিন্তু আমাদের অর্থাৎ বাঙালী হিন্দুদের তাহা প্রচুর পরিমাণে আছে। আমরা সর্ব্বধর্ম্মের মূল-মর্ম্ম বিষয়ে সর্ব্বদাই ওয়াকিবহাল। আমাদের দার্শনিকতার জোরে আমরা সমস্ত কিছুই পরিপাক করিতে সক্ষম। মুসলমানই বা

হইতে পারিব না কেন? একদিন যে যুক্তিবলে আমরা দলে দলে স্কুলকলেজ ও চাকরি ছাড়িয়া খদ্দর পরিয়া চরকা ঘুরাইয়াছিলাম, সেই যুক্তিবলেই আমরা এখন দলে দলে মন্দির ছাড়িয়া মসজিদে গিয়া কলমা পড়িতে পারিব না কেন? কিসের বাধা? ইহাতে কত বড় একটা সমস্যার সুন্দর সমাধান হইয়া যাইবে ভাবিয়া দেখুন দেখি। রসুন পেঁয়াজ মুর্গি মুসলমান না হইয়াই তো আমরা স্বচ্ছন্দে হজম করিতেছি, লুঙ্গি পরাটাও আমাদের মধ্যে প্রচলিত রহিয়াছে। আমাদের মন যেরূপ উদার তাহাতে কোরান অথবা কলমা পড়াও আমাদের পক্ষে অসম্ভব হইবে না। অথচ তাহাতে সুবিধা কত! আমাদের জাতীয় জঠরের পরিপাকশক্তি এরূপ প্রবল যে, আমার ধারণা, আমাদের দ্বারা সব কিছুই সম্ভব। ইতি-পূর্ব্বে অর্থাৎ কংগ্রেস যখন হয় নাই, তখন আমরা পাশ্চাত্য সভ্যতার নব নব আদর্শ অতি সহজেই হজম করিয়াছিলাম এবং সম্ভবত তাহারই উত্তেজনায় কংগ্রেসের জন্মদান করিয়াছিলাম। পুত্রের অত্যাচার হইতে পরিত্রাণ পাইবার নিমিত্ত পিতাকে যেমন অনেক সময় প্রতিবেশীর শরণাপন্ন হইতে হয়, কংগ্রেসের অত্যাচার হইতে আত্মরক্ষা করিবার নিমিত্ত আমাদের সেইরূপ মুসলমানধর্ম্মের আশ্রয় লইতে হইবে। আমার বিশ্বাস, আমরা তাহা পারিবও। কারণ কবি বলিয়াছেন, "শক হূন দল পাঠান মোগল এক দেহে হ'ল লীন!" আমরা তুচ্ছ নহি। প্রয়োজন হইলে আমরা অসাধ্য সাধন করিতে পারি। আমি এত কথা বলিলাম, তাহার কারণ আপনার নাতিটি বেকার বসিয়া আছে। সে আমার সহপাঠী ছিল, এবং সে যে তীক্ষ্ণধী এ বিষয়েও আমার সন্দেহ নাই। কিন্তু সে বাঙালী হিন্দু। তাহাকে অনাহারে মরিতে হইবে। সে যদি

মুসলমান হইয়া যায়, অবিলম্বেই তাহার চাকুরি জুটিয়া যাইবে। আপনি এ বিষয়ে কি বলেন ?

প্রশ্নটার জন্য প্রস্তুত ছিলাম না। অপ্রস্তুতভাবে একটা ঢোঁক গিলিয়া ফেলিলাম। তাহার পর বলিলাম, আচ্ছা, ভাবিয়া দেখি।

নুরুদ্দিন চলিয়া গেল।

জ্ঞানীগণের পরামর্শ অনুযায়ী সমস্ত জিনিষটা তলাইয়া দেখিতেছি ; কিন্তু মনে হইতেছে সমস্তই অতল।

দুই বন্ধু

জনৈক বাল্যবন্ধু পত্রযোগে অনুযোগ করিয়াছে, আমি কেন তাহাকে এখনও মনে করিয়া রাখি নাই! শ্লেষও করিয়াছে, এখন বড়লোক হইয়াছি, তাহার মত নগণ্য ব্যক্তিকে মনে রাখিবই বা কেন? আমিও অবাক হইয়া ভাবিতেছি, যাহার একদিনের অদর্শনে বিশ্বভুবন অন্ধকার হইয়া যাইত তাহাকে বেশ স্বচ্ছন্দে ভুলিয়াছি তো, বৎসরান্তেও তাহার কথাটা একবার মনে পড়ে না! আমি ইচ্ছা করিয়া, জোর করিয়া অথবা বদমায়েসি করিয়া তাহাকে ভুলিয়া যাই নাই। মন আপনি তাহাকে ভুলিয়া বসিয়া আছে এবং এতদিন পরে তিরস্কৃত হইয়া লজ্জা অনুভব করিতেছে।

কিন্তু কেন? মনের এরূপ আচরণের কারণটা কি?

চিন্তা করিতে লাগিলাম। সম্যকরূপে চিন্তা করিবার পর যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম, তাহা বিস্ময়কর। সিদ্ধান্তের জবরদস্তিতে পড়িয়া আমাকে স্বীকার করিতেই হইতেছে যে, আমি মারা গিয়াছিলাম বলিয়াই তাহাকে ভুলিয়াছি। একবার দুইবার নয়, এ জীবনে বহুবার মরিয়াছি এবং বহুবার নবজন্ম লাভ করিয়াছি। পূর্ব্বজীবনের আসবাবপত্র নবজীবনে অচল। নবলব্ধ জীবনের পারিপার্শ্বিক, দৃষ্টিভঙ্গি. স্বার্থ-সংঘাত, ভাললাগা-মন্দলাগা পূর্ব্বজীবন হইতে এতই স্বতন্ত্র যে, পূর্ব্বজীবনের কোন কিছু তাহাতে খাপ খায় না এবং খাপ খায় না বলিয়াই ধীরে ধীরে অপসারিত হইতে হইতে বিস্মৃতির অতলে তলাইয়া যায়। ঐতিহাসিক অথবা প্রত্নতাত্ত্বিকগণ যেমন সহসাপ্রাপ্ত শিলালিপি, অস্থিখণ্ড অথবা তৈজসাংশ অবলম্বন

করিয়া অতীত যুগের প্রাক্তন পৃথিবীর রূপ রস চালচলনের আভাস পান, আমরাও তেমনই ইতস্ততবিক্ষিপ্ত দুই একখানা পুরাতন চিঠি, বিবর্ণ ফোটো অথবা ঠাকু'মা-মুখ-নিঃসৃত স্মৃতিকথার প্রভাবে আমাদের বিগত মৃতজীবনের পরিচয় পাইয়া নানাভাবে বিচলিত হইয়া উঠি। বর্ত্তমানের ঝালমাংসলোলুপ আমি যে অতীত কালে দুধভাত ছাড়া আর কিছুই পছন্দ করিতাম না, ব্যঞ্জনে সামান্য ঝালরস থাকিলেও যে আমি গলদশ্রু-লোচনে বিক্ষুব্ধ হইয়া পড়িতাম এ কথা অবিশ্বাস্য হইলেও সত্য। আমার ভিতরের ও বাহিরের প্রত্নতাত্ত্বিকগণ প্রমাণ-প্রয়োগ-সহকারে এই অবিশ্বাস্য ব্যাপারটাকে বিশ্বাসযোগ্য করিয়া তুলিয়াছেন, অস্বীকার করিবার আর উপায় নাই। সেকালের দুধভাতপ্রিয় সাত্ত্বিক বালকটি আজকাল প্রত্যহ কড়মড় করিয়া অস্থি চর্ব্বণ করিতেছে এবং মাংসে ঝাল কিঞ্চিন্মাত্রও কম পড়িলে সগর্জ্জনে পাচকের উপর ঝাল ঝাড়িতেছে। ইহা বিস্ময়কর বটে, কিন্তু সত্য। দুধভাতকে ভুলিয়াছি। এই বিস্মৃতির জন্য সেই দুধভাত অভিমানভরে আমাকে পত্র লিখিয়াছে। কি করিব, ভাবিয়া পাইতেছি না। অনেক ভাবিয়া শেষে সরল সত্য কথাই লিখিলাম। লিখিলাম, বাল্যকালে দুধভাত আমার প্রিয়বস্তু ছিল, এখন মাংস ধরিয়াছি। বাল্যকালে তোমার সাহিত্যপ্রীতি আমাকে মুগ্ধ করিত, এখন সাহিত্য ছাড়িয়া আমি পাটে মন দিয়াছি। সুতরাং তোমাকে ভুলিব, ইহা বিচিত্র নহে। এতদিন পরে তুমি আমাকে স্মরণ করিলে কেন, ইহাই আমার বিস্ময়ের কারণ হইয়াছে।

বন্ধুর উত্তর আসিল। লিখিয়াছে. আমরা এই জীবনেই নব নব জন্মলাভ করি, তাহা অতীব সত্য। তোমার দুগ্ধপ্রিয়তা মাংস-

প্রিয়তায় এবং মাংসপ্রিয়তাও হয়তো কালক্রমে অবশেষে সাগু অথবা সুক্তো-প্রিয়তায় পরিণতি লাভ করিয়া বিবর্ত্তনবাদের মাহাত্ম্য ঘোষণা করিবে, স্বীকার করি। সাহিত্যের নেশা অর্থের নেশায় পর্য্যবসিত হইয়া শেষ পর্য্যন্ত যশের নেশায় দিশাহারা হইয়া পড়ে, তাহাও অস্বীকার করিতেছি না। কিন্তু বন্ধু, তুমি তোমার নিজের দিকটাই কেবল দেখিতেছ কেন? আমার দিকটাও দেখ। তুমিই কেবল নব নব জন্ম লাভ করিতেছ, তোমার গুটিপোকাই কেবল প্রজাপতি হইয়া যাইতেছে, আর আমরা স্থাণুবৎ একস্থানে অচল হইয়া রহিয়াছি, এ কথা ভাবিলে কিরূপে? আমিও চুপ করিয়া বসিয়া নাই, আমারও বিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। সংক্ষেপে, আমিও পাটের দালালি সুরু করিয়াছি। পরম্পরায় শুনিলাম, তুমিও পাট-জগতে প্রবেশ করিয়াছ, সেইজন্যই পত্র লিখিয়াছিলাম। অকারণে নয়, অতিশয় স-কারণে পূর্ব্বপত্রখানি ভূমিকাস্বরূপ ছাড়িয়াছিলাম। আইস, উভয়ে মিলিয়া ব্যবসায় করি। তুমি আমার বাল্য-বন্ধু এবং··· ইত্যাদি।

অত্যন্ত উল্লসিত হইয়া উঠিলাম। শুধু তাহাই নয়, তাহার সহিত ব্যবসায়-বন্ধনে সাগ্রহে আবদ্ধ হইবার নিমিত্ত এক দীর্ঘ পত্রও তাহাকে লিখিয়া ফেলিলাম। লক্ষ্মীদুলালকে ব্যবসায়-সঙ্গীরূপে পাইব, ইহা যে স্বপ্নাতীত ব্যাপার! উৎসুকভাবে উত্তরের প্রতীক্ষায় রহিলাম।

কয়েকদিন পরে বন্ধু প্রাণকান্তের সহিত সাক্ষাৎ ঘটিল। প্রাণকান্তের নিকট প্রায় কোন কথাই আমি গোপন রাখি না। এটিও রাখিলাম না। শুনিয়া প্রাণকান্ত অভ্যাসমত খানিকক্ষণ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া রহিলেন। তাহার পর বলিলেন, লক্ষ্মীদুলাল গুঁই?

তালতলার? সে তো পয়লা নম্বরের জোচ্চোর। শুনিয়াছি, তিনজন লোকের গলা সে অতিশয় চতুরতার সহিত কাটিয়াছে।

প্রশ্ন করিলাম, চতুরতার সহিত কাটিয়াছে মানে?

মানে, যখন ছুরি চালাইতেছিল, তাহারা কিছুই বুঝিতে পারে নাই। একজন তো ভাবিয়াছিল, তাহার হিতার্থেই অস্ত্রোপচার করা হইতেছে।

লক্ষ্মীদুলালের এবম্বিধ অস্ত্রপটুতার কথা জ্ঞাত ছিলাম না। বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া ঢোঁক গিলিলাম।

প্রাণকান্ত পুনরায় বলিলেন, আমাকে ঘুণাক্ষরে কিছু না জানাইয়া তুমি গলাটা স্বচ্ছন্দে বাড়াইয়া দিলে! বেশ তো!

বলিলাম, বাল্যবন্ধু, অর্থাৎ—

বাল্যবন্ধু হইলেই যুধিষ্ঠির হইতে হইবে, কোন্ আইনে তাহা লেখে?

আইন কোন নাই, সত্য। কিন্তু যেরূপ উচ্ছ্বসিত হইয়া তাহাকে পত্র লিখিয়াছি, তাহাতে আমার পক্ষে পশ্চাৎপদ হওয়া এখন শক্ত। এক রকম অসম্ভব—মানে ইয়ে আর কি! দেখা যাক না, কি লেখে সে!

প্রাণকান্ত ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া কিছুক্ষণ গুম হইয়া বসিয়া রহিলেন। তাহার পর 'যা খুশি কর' বলিয়া উঠিয়া গেলেন।

কয়েকদিন অতিশয় ভয়ে ভয়ে কাটাইলাম। হে ভগবান, হে দয়াময় হরি, লক্ষ্মীদুলালের বুদ্ধিভ্রংশ কর, সে যেন কিছুতে না রাজি হয়। আমার মত ক্ষীণগ্রীব প্রাণীকে বাগে পাইলে সে তো নিমেষে শেষ করিয়া ফেলিবে।

দিন দশেক পরে লক্ষ্মীদুলালের উত্তর আসিল।

অত্যন্ত হর্ষভরে পড়িলাম, ভাই রামতারণ, এখন আমি নানা ঝঞ্ঝাটে বিপন্ন, আগামী যুদ্ধেরও কোন স্থিরতা নাই। চেম্বারলেন মন্ত্রী থাকাকালীন নূতন কিছু আরম্ভ করিতে ভরসা পাইতেছি না। ভবিষ্যতে স্থযোগ পাইলে ব্যবসা ফাঁদিতে দেরি হইবে না, আপাতত উহা স্থগিত থাক।

দুর্গা শ্রীহরি ভগবান তাহা হইলে আছেন।

পরমুহূর্ত্তেই কিন্তু আস্তিক্য-বুদ্ধিতে ঘা লাগিল।

প্রাণকান্ত আসিয়া প্রশ্ন করিলেন, তোমার লক্ষীদুলালের খবর কি হে?

পত্র আসিয়াছে, সে রাজি নয়।

সস্মিতমুখে পত্রখানি পাঠ করিয়া প্রাণকান্ত বলিলেন, চালটা অব্যর্থ হইয়াছে দেখিতেছি।

কিসের চাল?

দাবার হে, দাবার। দাবা খেলা না জানিলে এ দুনিয়ায় কাহাকেও দাবানো শক্ত। শেখ, দাবা খেলাটা শেখ।

খুলিয়া বল।

বর্ত্তমানে লক্ষ্মীদুলালের যিনি মন্ত্রী, তাঁহার নাম শশী হালদার। সেই শশী হালদাদের অন্তরঙ্গ সুহৃৎ যিনি, তিনি আমারও সুহৃৎ, নাম —জগদ্বন্ধু। সেই জগবন্ধুকে পত্র লিখিয়াছিলাম।

কি লিখিয়াছিলে?

লিখিয়াছিলাম, পরম্পরায় অবগত হইলাম যে, লক্ষ্মীদুলালবাবু নাকি আমাদের রামতারণবাবুর সহিত পার্টনারশিপে ব্যবসায় করিতে করিয়াছেন। রামরতণবাবুকে ভাল করিয়া চিনি বলিয়াই গোপনে

তোমাকে জানাইতেছি যে, পার তো লক্ষ্মীদুলালবাবুকে সাবধান করিয়া দিও। রামতারণকে আমি ব্যক্তিগতভাবে জানি, এদিকে কথায় কথায় সে নিরীহতার প্রতিমূর্ত্তি, আসলে কিন্তু সে নর-রূপী এম্‌ডেন। বহু জাহাজ ডুবাইয়াছে। লক্ষ্মীদুলালবাবু শুনিয়াছি সজ্জন, তিনি আসিয়া রামতারণের ফাঁদে যেন পদক্ষেপ না করেন।

একটু থামিয়া প্রাণকান্ত পুনরায় বলিলেন, ফল ফলিয়াছে দেখিতেছি। তাহা ছাড়া তুমি তো চোরই, ফাঁকি দিয়া আমার নিকট হইতে কতকগুলো টাকা ওই মাতাল দামোদরটাকে ধার দিয়াছ। আমি কিছু বুঝি না যেন!

আমার বলিবার কিছু ছিল না, চুপ করিয়া রহিলাম। সহসা মনে হইল, প্রাণকান্ত লক্ষ্মীদুলালের খবর পাইল কি করিয়া? বলিলাম, লক্ষ্মীদুলাল যে জুয়াচোর, এ সংবাদ তোমাকে দিল কে?

কেহ নয়, আমি জানি।

প্রাণকান্তের চক্ষু দুইটি চাপা হাসিতে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সহসা ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া প্রাণকান্ত বলিয়া উঠিলেন, তোমার এ বয়সে পাটের ব্যবসা করার কোন মানে হয়? ঋণে তোমার চুল বিকাইয়া রহিয়াছে, পুনরায় ঋণ করিয়া পাটের ব্যবসা করার অর্থ কি?

লাভ হইলে ঋণ শোধ করিব।

পৃথিবীতে একদল লোক কবিতা লেখে এবং আর একদল লোক তাহা পড়ে। একদল লোক ঋণ করে এবং আর একদল লোক তাহা শোধ করে। তুমি প্রথম দলের লোক, ঋণ শোধ করা তোমার কর্ম্ম নয়। ব্যবসায় করা তোমার পক্ষে অব্যাপার।

সোজাসুজি মানা করিলেই পারিতে।

সহজভাবে মানা করিলে কেহই কিছু শুনে না।

অর্থাৎ ?

অর্থাৎ শুনিতে বাধ্য না করিলে কেহ কিছু শুনে না।

মাথা চুলকাইতে লাগিলাম। সহসা মনে একটা কৌতূহল হইল, প্রাণকান্ত ছেলেবেলায় কেমন ছিল কে জানে!

প্রাণকান্ত, ছেলেবেলায় তোমার জীবনের বিশেষত্বটা কি ছিল বল তো?

হঠাৎ ?

বল না।

কিছুক্ষণ ভাবিয়া প্রাণকান্ত বলিলেন, খুব ছেলেবেলায় অঙ্কে জিরো পাইতাম।

বলিয়া সে হাসিল, তাহার সেই চাপা কৌতুকপূর্ণ হাসি।

বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হইল না। কারণ প্রাণকান্ত এম,-এ তে গণিতে প্রথম হইয়াছিল, ইহা আমি জানি।
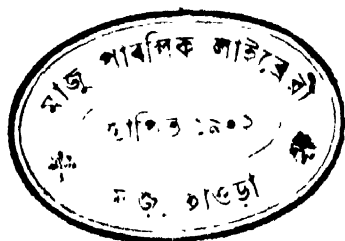
আত্মদর্শন

এক

যাহার একদিন এত উপকার করিয়াছিলাম, সেই কিনা শেষকালে এই করিল—এই জাতীয় খেদ করিবার সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য অনেকেরই হইয়াছে। আমার হইয়াছে এবং আমিও হয়তো অনেকের এই জাতীয় খেদের কারণ হইয়াছি। জিনিসটা অভাবনীয় অথবা অচিন্ত্যপূর্ব্ব নয়, এতকাল মানব-সমাজে বাস করিতেছি, মনে কড়া পড়িয়া যাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু সবিস্ময়ে লক্ষ্য করিতেছি, এত আঘাত সত্ত্বেও মনের কোমলতা (অথবা অহমিকা) কিছুমাত্র হ্রাসপ্রাপ্ত হয় নাই। দামোদরের কৃতঘ্নতায় মন বেশ বিচলিত হইয়া উঠিয়াছে। দামোদর আত্মীয় বলিয়া, নানা দোষে দুষ্ট অভাবগ্রস্ত অসহায় বলিয়া একদা তাহার প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হইয়াছিলাম এবং প্রিয় বন্ধু প্রাণকান্তের প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডের টাকাগুলি মিথ্যা চাতুরি দ্বারা সংগ্রহ করিয়া বিপন্ন দামোদরকে দিয়াছিলাম, এবং ইহাও মনে পড়িতেছে, বেশ একটা আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়াছিলাম। মূঢ়ের মত বিশ্বাস করিয়াছিলাম, দামোদর যথাসময়ে টাকাগুলি প্রত্যর্পণ করিবে এবং আমার সহৃদয়তার জন্য শতমুখে উচ্ছ্বসিত হইয়া প্রশংসা করিবে। প্রাণকান্ত অবশ্য ব্যাপারটা এখন জানিতে পারিয়াছে এবং ইহা লইয়া যখন তখন তাহার স্বভাবসুলভ তীক্ষ্ণতায় টিপ্পনীও কাটিতেছে। স্থির করিয়াছি, যেমন করিয়া হউক প্রাণকান্তের টাকাটা পরিশোধ করিয়া দিব। যেমন করিয়া হউক বলিতেছি বটে কিন্তু উপায় একটিমাত্রই আছে, গৃহিণীর গহনাগুলি। গৃহিণী

বৃদ্ধা হইয়াছেন, অলঙ্কারের আর প্রয়োজন নাই। কিন্তু প্রয়োজন নাই বলিয়াই বোধ হয় প্রয়োজন আরও বেশি। গৃহিণীকে কি ভাবে ভুলাইয়া গহনাগুলি হস্তগত করিব, তাহাও একটা সমস্যা বটে। এখন বৃদ্ধ হইয়াছি, গৃহিণীকে সম্মোহিত করিবার দুইটি অস্ত্রই বেহাত হইয়া গিয়াছে। যৌবনও নাই, উপার্জ্জনক্ষমতাও নাই। যাক সে কথা, দামোদরের কথা বলিতেছিলাম, তাহাই বলি।

বলা বাহুল্য দামোদর টাকাটা প্রত্যর্পণ করে নাই। শুধু তাহাই নয়, সেই বেঁটে কালো দামোদর নাকি উত্তেজনাভরে পায়ের অঙ্গুলিগুলির উপর দাঁড়াইয়া তর্জ্জনী-উৎক্ষিপ্ত-দক্ষিণহস্ত আস্ফালন-পূর্ব্বক আমার নামে যেখানে সেখানে অকথ্য ভাষায় নানা মিথ্যা কুৎসা রটনা করিয়া বেড়াইতেছে। আমি যে নিখুঁত লোক, তাহা বলিতেছি না, আমি দামোদরের আচরণের কথা বলিতেছি। হিসাব-মত ইহার জন্য তাহার গলায় পা দিয়া জিহ্বাটি সজোরে টানিয়া বাহির করা উচিত এবং ভোঁতা ছুরি দ্বারা পেঁচাইয়া পেঁচাইয়া জিহ্বাটি আমূল কর্ত্তন করিয়া তপ্ত তৈলে সেটি নিক্ষেপ করা উচিত। কিন্তু দেশের আইন এবং আমার বর্ত্তমান মনোবৃত্তি ইহার অনুকূল নহে। বার্দ্ধক্যের জন্যই হউক, অথবা আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্যই হউক, যে সকল ঘটনা প্রতিহিংসা অথবা রোষবহ্নির ইন্ধন জোগাইত, বর্ত্তমানে সেই সকল ঘটনাই দার্শনিকতার খোরাক জোগাইতেছে। দামোদরের ব্যবহারে ক্ষুণ্ণ হইয়াছি সত্য, কিন্তু তাহার অসদাচরণ আমার নিবন্ধটির মালমশলা সরবরাহ করিতেছে বলিয়া তাহার প্রতি একরূপ অদ্ভুত কৃতজ্ঞতাও অনুভব করিতেছি।

বিচিত্র মানুষের মন!

দুই

ভাবিতেছি, মানুষ এমন করে কেন? যাহার উপকার করিলাম, সেই এমন বদ্ধপরিকর কৃতঘ্ন হইয়া ওঠে মনস্তত্ত্বের কোন্ নিগূঢ় নিয়ম অনুসারে? অথচ সঙ্গে সঙ্গে ইহাও মনে পড়িতেছে যে, সকলে তো এমন করে না। হিরু জেলেকে কবে এক ফোঁটা হোমিওপ্যাথি ঔষধ দিয়াছিলাম, এবং ইহাও নিশ্চিত জানি যে, আমার চিকিৎসা-নৈপুণ্যে নহে, নিতান্তই দৈবক্রমে তাহার কলিক বেদনাটি সারিয়া গিয়াছিল। হিরু কিন্তু আজও কৃতজ্ঞ। সেদিনও কুমড়ো-পাতায় মুড়িয়া কিছু মৌরলা মাছ সসঙ্কোচে উপহার দিয়া প্রণাম করিয়া গেল। মৌরলা মাছ অবশ্য অল্পই, কিন্তু তাহার কৃতজ্ঞতার গভীরতা তো অল্প নয়।

আরও একটা ঘটনা মনে পড়িতেছে। বহুকাল পূর্ব্বের ঘটনা। একবার একটা ডাক-বাংলোয় অবস্থান করিতেছিলাম। শীতকাল। সন্ধ্যার সময় বেশ একটু বর্ষা নামিয়া শীতটাকে জাঁকাইয়া তুলিয়াছিল। এমন শীতের সন্ধ্যায় যাহা প্রয়োজন, আমার বেতের বাক্সটিতে প্রায় তাহার সমস্ত আয়োজনই ছিল। ধাপে ধাপে সুরু করিব ঠিক করিয়াছিলাম। কিন্তু প্রথম ধাপেই থামিয়া যাইতে হইল। স্টোভ জ্বালাইয়া এক পেয়ালা কড়া কফি প্রস্তুত করাইয়া মহানন্দে পান করিতেছি, এমন সময় মসমস করিয়া এক সাহেব আসিয়া উপস্থিত। সিক্ত সাহেব আসিয়াই ডাক-বাংলোর চাপরাসীকে চায়ের ফরমাস করিলেন। চাপরাসী করজোড়ে নিবেদন করিল যে, এই অসময়ে গ্রামের সমস্ত দোকান বন্ধ হইয়া গিয়াছে, চায়ের কোন সরঞ্জামই সে সংগ্রহ করিতে পারিবে না। শুনিলাম সাহেব যে-সে সাহেব নহেন, স্বয়ং ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব। মোটরযোগে সফর করিতেছিলেন,

প্রায় মাইলখানেক দূরে মোটর বিগড়াইয়াছে। তিনি পদব্রজে আসিয়া ডাক-বাংলোয় আশ্রয় লইয়াছেন। তাঁহার জিনিসপত্র সব মোটরে এবং তাঁহার আরদালীগণ সকলেই বানচাল মোটরের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত। আমার ভদ্রতাজ্ঞান উদ্বুদ্ধ হইল। সাহেবের সহিত আলাপ করিলাম এবং সবিনয়ে বলিলাম, তিনি যদি আমার এক কাপ কফি পান করেন, আমি অত্যন্ত বাধিত হইব। ধন্যবাদ-জ্ঞাপনান্তে সাহেব বলিলেন, থাক, কফির প্রয়োজন নাই। আমি ছাড়িলাম না, অনেক বলিয়া কহিয়া সাহেবকে একপাত্র কফি পান করাইলাম এবং উগ্রতর পানীয়েরও আভাস দিলাম। সাহেব একটু ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া দৃঢ়ভাবে বলিলেন যে, তিনি ওসব চাহেন না। আমিও আর সে রাত্রে ওদিকে গেলাম না! সেই সাহেব কিন্তু এখনও ভোলেন নাই। যতদিন ভারতে ছিলেন, নানারূপে আমার প্রত্যুপকার করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। এখন চাকুরি হইতে অবসর লইয়াছেন, এখনও মাঝে মাঝে পত্র লেখেন এবং প্রতিবার নববৎসরে শুভেচ্ছাজ্ঞাপক কার্ড পাঠাইয়া থাকেন! এক কাপ কফির বিনিময়ে সাহেবের সৌহার্দ্দ্য লাভ করিয়াছিলাম।

ভাবিতেছি, দামোদরেরাই এমন করে কেন?

বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হইলাম।

তিন

অনেকক্ষণ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া থাকিয়া এবং অনেক মস্তককণ্ডুয়ন করিয়া যে কথাটি আমার মনে উদিত হইতেছে, তাহা লিপিবদ্ধ করিতে সঙ্কুচিত হইতেছি। একটি সংস্কৃত কথা শুনিয়াছিলাম, শতং

বদ, মা লিখ। সংস্কৃতটা নির্ভুল কিনা জানি না, উক্তিটি কিন্তু অভিজ্ঞতাপূর্ণ। যাহা লিখিব, তাহা আমার বিপক্ষে সাক্ষ্যস্বরূপ কোথাও না কোথাও হয়তো টিকিয়া থাকিবে, এবং ভবিষ্যৎ যুগের কোন দামোদর হয়তো ইহারই উপর নির্ভর করিয়া ভবিষ্যৎ যুগের কুৎসাকামী শ্রোতাদের মনোরঞ্জন বিধান করিবে। এই লেখারই নজির দেখাইয়া বলিবে, দেখিতেছ, লোকটার বুদ্ধির দৌড় ! বুঝিবে না যে, একটি লেখা, কথা বা আচরণের দ্বারা মানুষের বিচার করিতে যাওয়া অদূরদর্শিতার পরিচায়ক ; নির্ব্বুদ্ধিতা কথাটা আর ব্যবহার করিলাম না। মানুষ মেঘের মত ক্ষণে ক্ষণে বদলায়। তাহার পরিবর্ত্তনশীল রূপের সমন্বয়ই সে ; কোন একটা বিশেষ রূপ লইয়া বিচার করিলে ভুল হইবে।

কি কথায় কি কথা আসিয়া পড়িল, দেখুন। এই তো আমাদের মহদ্দোষ। টু দি পয়েন্ট অর্থাৎ নিক্তির ওজনে আমরা কিছুই করিতে পারি না। ছুঁচা মারিতেও পাঁয়তারা কষি এবং মশা মারিবার জন্য কামান দাগি।

যাক, আর ভণিতা করিব না, আসল কথাটা ব্যক্ত করিয়া ফেলি। চিন্তা করিয়া দেখিলাম, দামোদর-জাতীয় লোকের উপকার করিতে গিয়া আসলে আমরা অজ্ঞাতসারে তাহাদের অপমান করি এবং তাহাদের আহত আত্মাভিমান সুযোগ পাইলেই ফোঁস করিয়া উঠে। কথাটা আর একটু পরিষ্কার করিয়া বলা দরকার বোধ হয়। দামোদর এবং আমি সমশ্রেণীর লোক। ঘটনাচক্রের সামান্য ইতর-বিশেষের জন্য দামোদর ভিক্ষুক এবং রামতারণ (আমি) দাতা হইয়াছি। ঘটনাচক্রের অন্যপ্রকার ইতরবিশেষে ইহার বিপরীতটাও সম্ভব হইতে পারিত। ভিক্ষুক রামতারণের দাতা দামোদরের দ্বারস্থ হওয়াও

কিছুমাত্র অসম্ভব হইত না। কিন্তু ঘটনাচক্রের যোগাযোগে, গ্রহের চক্রান্তে অথবা পূর্ব্বজন্মের কোন হেরফেরে, যে কোন কারণেই হউক, একদা দামোদরকে ভিক্ষুকবেশে রামতারণের কৃপাভিক্ষা করিতে হইয়াছিল এবং রামতারণও বেশ আড়ম্বর-সহকারেই (অর্থাৎ পরের নিকট হইতে ঋণ করিয়াও) সেই ভিক্ষুকের প্রসারিত ভিক্ষাপাত্রে কিছু ভিক্ষা দান করিয়াছিল। কিন্তু আসলে সে কি করিয়াছিল ? আসলে সে সেই ভিক্ষুকটার আত্মসম্মানের মুখে সজোরে পদাঘাত করিয়াছিল। কথায় না বলিলেও কার্য্যত বলিয়াছিল, ওরে অধম ভিক্ষুক, আহা, তুই কষ্টে পড়িয়াছিস, তুই আত্মীয়, আয় তোকে এক মুষ্টি ভিক্ষা দিতেছি, ভিক্ষাপাত্রটা ভাল করিয়া তুলিয়া ধর। ভিক্ষুক তখন একটা ছদ্ম-কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া দন্তসার হাসি হাসিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহার অন্তর্নিবাসী মনুষ্যটি উপকার-কশাঘাতের জ্বালায় ছটফট করিয়া উঠিয়াছিল। আজ সে তাহারই প্রতিশোধ লইতেছে। উপকার তাহার নিকট কশাঘাতবৎ প্রতীয়মান হইয়াছিল, তাহার কারণ সে ও রামতারণ সমশ্রেণীর। সেও রামতারণ হইতে পারিত, কিন্তু হইতে পারে নাই। ইহাই তো যথেষ্ট ক্ষোভের কারণ। ইহার উপর আবার সেই রামতারণটার দ্বারেই ভিক্ষুকবেশে আসিতে হইল, এবং সে তাহাকে হাসিমুখে ভিক্ষাও দিল! এ অপমানের কি শেষ আছে, না ইহা ভুলিবার ? পরীক্ষায়-ফেল-করা ছেলে পরীক্ষায়-পাস-করা ছেলের সম্বন্ধে কোন দিনই আন্তরিক প্রেম পোষণ করে না; যে চাকরি পায় নাই সে, যে চাকুরি পাইয়াছে তাহার উপর, অজ্ঞাতসারেই বীতশ্রদ্ধ। বিজয়ী ও পরাজিতের সম্পর্ক কখনও মধুর হইতে পারে না। এই একই কারণে পোষ্য-আত্মীয় পোষক-আত্মীয়ের নিন্দা করিয়া সুখ পায়। অসমর্থ ভ্রাতা ,সমর্থ ভ্রাতার

সাহায্য লাভ করিয়াও অসন্তুষ্ট থাকে এবং দোষ-অনিসন্ধিৎসু হইয়া পড়ে। যে ঘটনাচক্রে অবনত, সে ঘটনাচক্রে উন্নত সমশ্রেণীর ব্যক্তিকে কখনও ভালচক্ষে দেখে না এবং তাহার নিকট কৃপাপ্রার্থী হইতে বাধ্য হইলে মরমে মরিয়া যায়। আসলে মর্ম্ম কিন্তু মরে না, ভিতরে ভিতরে জ্বলিতে থাকে, এবং সেই অন্তর্নিরুদ্ধ জ্বালা মধ্যে মধ্যে কুৎসা-উদগীরণ করিয়া মর্ম্মান্তিকরূপে আত্মপ্রকাশ করে। যাহারা উহারই মধ্যে একটু ভদ্র অর্থাৎ পালিশ-করা, তাহারা কুৎসাটা প্রকাশ্যত হয়তো উদগীরণ করে না, কিন্তু মনে মনে বিষাইয়া থাকে। তাহাদের বক্র হাসি, বক্র কথাবার্ত্তা, বক্র ব্যবহার তাহাদের বিষ-বক্র অন্তরের পরিচয় বহন করে। সুতরাং সমশ্রেণীর লোকের যদি উপকার করিতেই হয়, প্রকাশ্যত করিতে নাই। গোপনে করাই শ্রেয়ঃ। ডান হাতের দান বাঁ হাতও যেন না জানিতে পারে। জানিতে পারিলেই উপকৃত ব্যক্তি তোমার শত্রু হইয়া দাঁড়াইবে। হতবুদ্ধি তুমি ভাবিতে থাকিবে, যাহার এত উপকার করিলাম, সেই কিনা শেষটা এমন করিল! তলাইয়া দেখিবে না যে, প্রত্যক্ষ উপকার করিয়াছিলে বলিয়াই এই প্রত্যক্ষ পরিণতি হইয়াছে, এবং ইহাই স্বাভাবিক পরিণতি।

হিরু জেলে আমার সমশ্রেণীর লোক নহে। সে যে শ্রেণীতে বাস করে, তাহা বহুকাল হইতে লাঞ্ছিত ও অবজ্ঞাত এবং সেজন্য তাহার মনে ক্ষোভও বোধ হয় নাই। সুতরাং সে আমার নিকট হইতে যে উপকার পাইয়াছে, তাহা সকৃতজ্ঞ প্রসন্ন চিত্তেই গ্রহণ করিয়াছে। শিশু যেমন বয়স্কদের নিকট হইতে সানন্দে উপহার গ্রহণ করে এবং তদ্বারা যেমন তাহার আত্মাভিমান একটুও ক্ষুণ্ণ না, হিরুরও আত্মাভিমান তেমনই বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় নাই। হিরু আমার

সমকক্ষ নহে, সমকক্ষ হইবার কল্পনাও করে না। যেদিন করিবে, সেই দিনই এই সমস্যার উদ্ভব হইবে। সে দিনও বোধ হয় আসন্ন। হরিজনগণ ইতিমধ্যেই আমাদের সমপদবাচ্য হইয়াছেন এবং ভবিষ্যতে রক্ত ও সংস্কৃতির সম্পর্ক ঘটিয়া সত্য সত্যই হয়তো সমতা-প্রাপ্ত হইবেন। হিরু জেলেকে তখন অসঙ্কোচে দয়া করা চলিবে না।

সেই ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব সেদিন শীতসন্ধ্যায় আমার নিকট হইতে এক পেয়ালা কফি পান করা সত্ত্বেও কেন কৃতঘ্ন হইয়া উঠিলেন না, তাহার কারণ অনুসন্ধান করিতে গিয়া দেখিতেছি যে, সেদিন কফি পান করিয়া ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব যতটা না কৃতার্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাকে কফি পান করাইয়া আমি ততোধিক কৃতার্থ হইয়াছিলাম। অর্থাৎ সেদিন দয়ার্দ্র ভদ্র আমি শীতপীড়িত একজন মনুষ্যকে কফি পান করাই নাই, গদগদ দাসমনোভাবসম্পন্ন আমি একজন সাহেবকে কফি পান করাইয়া ধন্য হইয়াছিলাম। কই, শীতার্ত্ত চাপরাসীটার কথা তো আমার মনে পড়ে নাই! সুতরাং সাহেবকে আমি কৃপা করি নাই, সাহেবই আমাকে কৃপা করিয়াছিল। কৃতঘ্ন হইতে হইলে আমারই হওয়া উচিত, এবং চিন্তা করিয়া সলজ্জভাবে স্বীকার করিতেছি যে, কৃতঘ্ন হইয়াছি। ব্যক্তিগতভাবে সেই সাহেবটার উপর নয়, সমস্ত সাহেব জাতটারই উপর মনে মনে চটিয়া আছি। তাহারা দয়া করিয়া আমাদের কাপে আমাদের প্রদত্ত কফি পান করিতেছে, বিনিময়ে পিঠ চাপড়াইয়া ধন্যবাদ দিতেছে, নানা রকমে উপকার করিবার চেষ্টা করিতেছে ইহা আমাদের অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে, এবং আমাদের এই জাতিগত দুর্ব্বলতাজনিত অস্বস্তি নানা ভাবে আমরা প্রকাশ করিয়া ফেলিতেছি। আমাদের

তথাকথিত স্বদেশ-প্রেমের মূল কথা বোধ হয় ইহাই। অর্থাৎ ইংরেজ সম্পর্কে সকলেই আমরা দামোদর। হয়তো—

চিন্তা-স্রোত ভিন্নমুখী হইল।

একটি ছোট মাটির ভাঁড় হস্তে প্রাণকান্ত আসিয়া প্রবেশ করিলেন, এবং চেয়ার টানিয়া সম্মুখে উপবেশন করিলেন।

চার

ভাঁড়টি মাটিতে নামাইয়া রাখিয়া প্রশ্ন করিলেন, বাড়িতে পুরাতন চাউলের জালা আছে?

থাকা সম্ভব। কেন বল তো?

তাহা হইলে তাহার ভিতর এই কাগজটি সযত্নে রাখিয়া দাও। চালের ভিতর বেশ করিয়া ঢুকাইয়া রাখিও।—বলিয়া একটি কাগজ তিনি পকেট হইতে বাহির করিলেন।

কি ওটা?

হ্যাণ্ডনোট। পড়িয়া দেখ।

দেখিলাম, লেখা আছে, দামোদর চৌধুরী প্রাণকান্ত বিশ্বাসের নিকট হইতে শতকরা ছয় টাকা হার সুদে দেড় হাজার টাকা কর্জ্জ করিতেছে। বিস্মিত হইলাম, ব্যাপার কি!

নির্ব্বিকার প্রাণকান্ত বলিলেন, হ্যাণ্ডনোটটি জাল। দামোদরের নিকট হইতে টাকাটা আদায় করিতে হইবে তো। হ্যাণ্ডনোটের জালরূপ লোপ করিবার জন্য পুরাতন চাউলের মধ্যে ওটিকে কিছুকাল রাখিতে হইবে। অভিজ্ঞদের ইহাই মত।

চিন্তিতকণ্ঠে বলিলাম, জাল?

সইটা জাল নয়, দামোদরেরেই স্বহস্তের সহি। কোন চতুর ব্যক্তির সহায়তায় মাতালটাকে মদ খাওয়াইয়া সাদা কাগজে সহি করাইয়া লইয়াছি। উপরের অংশটুকু অপরের লেখা।

চুপ করিয়া রহিলাম।

প্রাণকান্ত পুনরায় বলিলেন, দুই মাস পরে নালিশ করিব। ইতিমধ্যে টাকার জন্য তাহাকে তাগাদা কর।

আমাকে নির্ব্বাক দেখিয়া প্রাণকান্ত একটু উষ্মাভরেই বলিলেন, দেখ, তোমার ওসব ফিলজফি-টফি ছাড়। ঐ করিয়াই তুমি নিজে ডুবিয়াছ, আমাকেও ডুবাইতেছ। শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ—এটাও কিছু তুচ্ছ করিবার মত ফিলজফি নহে। চাণক্য লোকটা নিতান্ত বোকা ছিলেন না। সাপের মাথায় লগুড়াঘাত করাই সনাতন পদ্ধতি। লগুড় লইয়া মাথা ঘামাইতে গেলে সর্পাঘাতে মৃত্যু অবধারিত। এখনই গিয়া চালের জালার মধ্যে কাগজটি পুরিয়া ফেল। দামোদর-ভুজঙ্গকে বশে আনিবার উহাই একমাত্র মন্ত্র।

হঠাৎ নজরে পড়িল, মাটির ছোট ভাঁড়টি হইতে কতকগুলি কেঁচো বাহির হইয়া আসিতেছে। প্রাণকান্ত তাড়াতাড়ি ঝুঁকিয়া কেঁচোগুলিকে ভাণ্ডস্থ করিতে করিতে হাসিয়া বলিলেন, দেখ, কেঁচো নিরীহ, জলের মধ্যে মাছও নিরীহ। কিন্তু যিনি কেঁচো ও মাছ সৃজন করিয়াছেন, তিনিই, কি উদ্দেশ্যে জানি না, আমার মধ্যেও মৎস্যলোলুপতা ও বুদ্ধির সমাবেশ করিয়াছেন। সুতরাং আমি নিরুপায়। বঁড়শিবিদ্ধ নিরীহ কেঁচোর টোপ ফেলিয়া প্রলুব্ধ নিরীহ মৎস্যকে গাঁথিয়া ডাঙায় আমাকে তুলিতেই হইবে। তোমার দামোদরটি কিন্তু গভীর জলের মৎস্য, সাধারণ টোপ সে গিলিবে না, তাই জালের ব্যবস্থা করিয়াছি। ওটাকে আজই জালায় পুরিয়া ফেল।

বলিলাম, তোমার বাড়িতে চালের জালা নাই ?

আছে। কিন্তু জালার সন্নিকটে গৃহিণীও আছেন। গৃহিণীকে উল্লঙ্ঘন করিয়া জালার নিকট যাওয়া হিমালয় উল্লঙ্ঘন করিয়া তিব্বতে যাওয়ার অপেক্ষাও শক্ত। তাঁহাকে সমস্ত খুলিয়া বলিবারও উপায় নাই, তিনি ধর্ম্মপ্রাণা রমণী, অনর্থক একটা হৈ চৈ বাধাইয়া বসিবেন। যাঁহার সহিত এতকাল বাস করিয়াছি এবং বাকি জীবনটাও বাস করিতে হইবে, তাঁহার সহিত চটাচটি করিয়া সুখ নাই। তা ছাড়া তাঁহার জ্ঞাতসারে এমন কার্য্য করাও ঠিক নহে, যাহাতে আমার প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা লাঘব হইবার সম্ভাবনা। তুমিই এটুকু কর ভাই।—বলিয়া প্রাণকান্ত উঠিলেন।

কোথায় যাইতেছ ?

আঢ্যিদের শ্যাম-সায়রে। শুনিয়াছি, সেখানকার রোহিত-মৎস্যগুলি সত্যই নাকি অপরূপ। একদিনের জন্য ছিপ ফেলিবার অনুমতি পাইয়াছি।

এমন সময় দেখা গেল, আমার গৃহিণী সদলবলে অর্থাৎ পুত্রবধূ নাতি নাতনী সমভিব্যাহারে খিড়কি-দরজা দিয়া নির্গত হইলেন। নাতনীর বগলে পানের বাটা দেখিয়া বুঝিলাম, পাড়ায় কোন বাড়িতে বেশ কিছুক্ষণের জন্য আসর বসিবে।

প্রাণকান্ত বলিলেন, এইবার যাই, দেরি করা ঠিক হইতেছে না। তুমি এমন সুযোগ নষ্ট করিও না।

মুচকি হাসিয়া চলিয়া গেলেন।

কাগজখানি হাতে করিয়া বসিয়া রহিলাম এবং পুনরায় চিন্তা করিতে লাগিলাম। শেষকালে জালিয়াতির সহায়তা করিব ? দামোদর টাকা লইয়াছে তাহা ঠিকই কিন্তু এই দলিলখানা তো

মিথ্যা। দেড় হাজার টাকাটাই কি বেশি। মাত্র দেড় হাজার টাকার জন্য সত্য-পথভ্রষ্ট হইব ? সত্যনিষ্ঠার স্বপক্ষে বিবেক অনেক যুক্তি জোগাইতে লাগিল। গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া গেলাম।

চেতনা হইলে দেখিলাম, জালার ভিতর হাত পুরিয়া কাগজখানা চাউলের তলায় রাখিতেছি। দেড় হাজার টাকার জন্য নয়, দামোদর আমার নামে কুৎসা প্রচার করিতেছে বলিয়াই তাহার শাস্তি হওয়া উচিত।

আত্মদর্শন করিয়া চমকিত হইলাম।

চিরন্তনী

সকাল হইতে লক্ষ্য করিতেছি, প্রিয়া-মুখচন্দ্র আবৃত করিয়া মেঘ-সঞ্চার হইয়াছে। মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ স্ফুরিত হইতেছে। গর্জ্জন বর্ষণ আশঙ্কা করিতেছি এবং ম্রিয়মাণ হইয়া রহিয়াছি। পূর্ব্বে উতলা হইতাম, আজকাল গৃহিণীর ভাবান্তরে শঙ্কিত হইয়া পড়ি। বিষণ্ণ অন্তরে চিন্তা করিতেছি, এই ভাবান্তরের কারণ আমিই কি না, তাহাই সর্ব্বাগ্রে জ্ঞাতব্য। এই বয়সে গৃহিণীর বিরাগভাজন হইবার সামর্থ্য নাই, সুতরাং জ্ঞাতসারে এমন কিছু করি না, যাহা মেঘজনক। কিন্তু 'অজ্ঞাতসারে' বলিয়াও তো একটা কথা আছে, এবং এ সংসারে এতকাল বাঁচিয়া থাকিয়া এই সার-তত্ত্বটি উপলব্ধি করিয়াছি যে, অপরাধ এড়াইবার সাধ্য মানুষের নাই। কায়, মন অথবা বাক্য দ্বারা জ্ঞাতসারে অথবা অজ্ঞাতসারে সর্ব্বদাই কাহারও না কাহারও নিকট অপরাধী হইয়া পড়িতেছি। মানব-মনে ক্ষমা নামক সদ্‌গুণটির অস্তিত্ব না থাকিলে জীবনযাপন করা দুরূহ হইয়া উঠিত। বস্তুত গৃহিণীর নিকট জীবনে বহু প্রকারে অপরাধী প্রতিপন্ন হইয়া এই ধারণাই আমার মনে বদ্ধমূল হইয়াছে যে, তাঁহাকে বিবাহ করাটাই আমার পক্ষে অপ্রতিষেধ্য গুরুতম অপরাধ এবং আজীবন ক্ষমা-ভিক্ষা করা ছাড়া আর কিছু করিবার নাই। তাহাই করিয়া চলিয়াছি। আজিকার এই ভাবান্তর কি জাতীয় এবং কি ভাবে অগ্রসর হইলে সুরাহা হইবে, তাহাই ভাবিতেছিলাম, এমন সময় রঙ্গমঞ্চে বেণী দোলাইয়া 'গেজেট' অবতীর্ণা হইলেন। শুধু অবতীর্ণা হইলেন নয়, সমস্যাটির উপর আলোকপাতও করিলেন। আমার নয় বৎসরের

দৌহিত্রীপ্রবরা পাড়ার সকলের হাঁড়ির খবর রাখেন, সুতরাং এ খবরটি যে রাখিবেন, তাহাতে আর বিচিত্র কি! চোখ মুখ রহস্যময় করিয়া কর্ণ-কুহরের নিকট মুখখানি রাখিয়া বলিলেন, জান দাদু, মামা মামীকে এত্ত ভালবাসে!

উহার মামা মানে আমার পুত্র। সে একদিনের ছুটি লইয়া বাড়ি আসিয়াছিল। আজ চলিয়া গিয়াছে। এত স্বল্প সময়ের মধ্যে সে ভাগিনেয়ীর নিকট তাহার পত্নী-প্রেমের পরিচয় কি করিয়া রাখিয়া গেল, জানিবার জন্য কৌতূহলী হইলাম।

বলিলাম, যাঃ, বাজে কথা। কক্ষনও হতে পারে না।

নিশ্চয় বাসে। তা না হ'লে অমন একটা কাপড় আনলে কেন?

কি কাপড়?

ও, তা জান না বুঝি! মামা মামীমার জন্য এমন একটা শাড়ি এনেছে এত্ত সুন্দর; যেমন পাড়, তেমনই রঙ জান দাদু, লুকিয়ে এনে দিয়েছিল, আজ হঠাৎ মায়ের কাছে ধরা প'ড়ে গেছে।

যেন ভীষণ একটা ষড়যন্ত্র ধরা পড়িয়া গিয়াছে, এমনই মুখভাব করিয়া বলিলাম, বটে! তারপর?

তারপর সব জানাজানি হয়ে গেছে এখন। মামীর সে কি লজ্জা! মামীর ভয় হয়েছিল, দিদি বুঝি বকবে। দিদি বকতে যাবে কেন শুধু শুধু? এতে কেউ কখনও বকে, তুমিই বল না দাদু? সত্যি সত্যি, দিদি কিছু বকলে না, খালি বললে, বেশ তো।

এমন সময় লক্ষ্য করিলাম, দ্বারপ্রান্তে চাটুজ্জে-বাড়ির মন্টি চট করিয়া উঁকি মারিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল। মন্টি আমার নাতনীর সমবয়সী। এই উঁকির মধ্যে কি ইসারা ছিল বলিতে পারি না,

নাতনীও একছুটে বাহির হইয়া গেল। খানিকক্ষণ তাহার অপেক্ষায় রহিলাম। সে ফিরিল না, সম্ভবত মণ্টির সঙ্গে খেলায় মাতিয়াছে। আমিও চিন্তার খেলায় মাতিলাম। নাতিনী উপরোক্ত সমস্যাটির উপর আলোকপাত করিয়া গিয়াছিল। অন্তত সে আলোক এত যথেষ্ট যে, তাহা লইয়া ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বেশ খানিকক্ষণ মাথা চুলকানো চলে।

দুই

অর্থশাস্ত্রের দিক দিয়া চিন্তা করিলে পুত্রের এবম্বিধ অপব্যয়-প্রবণতার নিন্দা করিতে হয়। বধূমাতার শাড়ির অভাব নাই, আবার শাড়ি কেন? অপব্যয়-প্রবণতা নিঃসন্দেহে নিন্দনীয়, কিন্তু আমার গৃহিণীর মন-খারাপের অর্থ অর্থশাস্ত্রে নিহিত আছে, এ কথা স্বীকার করিতে মন ইতস্তত করিতেছে। এই রমণীটির সহিত বিগত অর্দ্ধ শতাব্দী ব্যাপিয়া ঘনিষ্ঠভাবে বসবাস করিতেছি। ইহার চরিত্রে অন্যান্য নানা সদ্‌গুণ অবশ্য লক্ষ্য করিয়াছি, কিন্তু অর্থশাস্ত্রের প্রতি প্রগাঢ় নিষ্ঠা লক্ষ্য করিয়াছি বলিলে সত্যের অপলাপ করা হইবে। বরং যতদূর মনে পড়িতেছে, আমরা উভয়েই অর্থশাস্ত্র নয়, অনর্থ-শাস্ত্রের চর্চ্চাতেই জীবনপাত করিয়াছি। অর্থশাস্ত্রের সাধারণ বিধান-গুলিকে বারম্বার অমান্য করিবার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল আমাদের। আজ সহসা অর্থশাস্ত্রের যাথার্থ্য হৃদয়ঙ্গম করিবার মত মানসিক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, এ কথা মনে করিবার কোন হেতু খুঁজিয়া পাইতেছি না। তবে মন-খারাপের কারণ কি? অর্থশাস্ত্র ছাড়িয়া ন্যায়শাস্ত্রের দিক দিয়া চিন্তা করিবার চেষ্টা করিলাম। পত্নীকে শাড়ি

কিনিয়া দেওয়া কি অন্যায়? নিরপেক্ষভাবে উত্তর দিতে হইলে বলিতে হয়, না। প্রাক্‌জীবনে নিজেও বহুবার এ কার্য্য করিয়াছি এবং তদ্দ্বারা গৃহিণীর বিরাগ নয়, অনুরাগই উৎপাদন করিয়াছি বলিয়া মনে পড়িতেছে। বস্তুত পতি পত্নীকে ভালবাসিয়া স্বোপার্জ্জিত অর্থদ্বারা কোন উপহার দিয়াছে, এই অতিশয় ন্যায়সঙ্গত কার্য্যকে গৃহিণী দূরের কথা, কোন তীক্ষ্ণতম ন্যায়চঞ্চুও বিধ্বস্ত করিতে পারিবেন কিনা সন্দেহ করি।

তাহা হইলে—। সহসা লক্ষ্য করিলাম, অতিশয় ভুল পথে চলিতেছি। এ পথে চলিলে একটা নৈতিক তর্কজালে বিজড়িত হইয়া পড়িব মাত্র, আর কোন লাভ হইবে না! আসল কথা হইতেছে, মন-খারাপ হয় কিসে? যাহা অন্যায় এবং অসঙ্গত, তাহা দেখিয়াই যে আমরা সকল সময় বিরক্ত হই, তাহা তো নয়। আমাদের ভাল-লাগা মন্দ-লাগার নিক্তিতে ন্যায়অন্যায়ের বাটখারা সব সময়ে চলে না। গ্রীষ্মকালে উত্তাপাধিক্য এবং বর্ষাকালে সলিল-বহুলতা ন্যায়সঙ্গত বলিয়াই আনন্দজনক নহে। বরং ইহাই সত্য কথা, যাহা বিরক্তিকর, তাহা ন্যায়সঙ্গত হইলে আরও বিরক্তিকর হইয়া উঠে। তাহাকে গালি দিবার অথবা প্রতিরোধ করিবার ন্যায্য উপায় না থাকায় তুঙ্গী ক্রোধ নিরুদ্ধ আক্রোশে গুমরাইয়া মরে। হয়তো পুত্রের এই কার্য্য অতিশয় ন্যায়সঙ্গত বলিয়াই গৃহিণীর মনো-কষ্টের কারণ হইয়াছে। ইহা যদি আইন-অনুযায়ী প্রতিবাদযোগ্য হইত, তাহা হইলে হয়তো এ অশান্তি হইত না; এমন কি পুত্রের এই অন্যায় অন্যায়ভাবে ক্ষমা করিয়াই গৃহিণী সুখী হইতেন। কিন্তু মনোকষ্ট হইল কেন? হেতুটা কি?

সহসা মনে হইল, ভূতোর সাহায্য ব্যতিরেকে এই অন্ধকারে

কোন কূল-কিনারা দেখিতে পাইব না। অবিলম্বে তাহাকে ডাকিলাম এবং তামাক দিতে বলিলাম।

তিন

তাম্রকূটের বুদ্ধি-বিকাশিনীর-শক্তি আছে, কি না জানি না, অন্তত সে সম্বন্ধে কোন বৈজ্ঞানিক মন্তব্য করিতে আমি অপারগ। কিন্তু ইহা ঠিক যে, উপর্য্যুপরি দুই ছিলিম শেষ করিয়া তৃতীয় ছিলিমের প্রারম্ভে মনে হইল, অন্ধকার স্বচ্ছ হইয়া আসিয়াছে।

অকস্মাৎ মুদিত নয়নের সম্মুখে একটি ষোড়শী তন্বী মূর্ত্তিপরিগ্রহ করিল। নবযৌবনের যাদুমন্ত্রে লাবণ্যময়ী মোহিনী মূর্ত্তি, কিন্তু চোখে জল। গভীর নিশীথে একা বসিয়া কাঁদিতেছে। সম্মুখে ভাত ঢাকা রহিয়াছে। একটু পরে এবং একটু অপ্রস্তুতভাবে তাহার স্বামী আসিয়া প্রবেশ করিল এবং গলা-খাঁকারি দিয়া সসঙ্কোচে বলিল, মানে, একটু রাত হয়ে গেল।

তন্বী নীরব।

যুবক আড়চোখে তাহার দিকে তাকাইয়া সম্ভবত কৈফিয়ৎস্বরূপ বলিল, কমলদার ওখানে, মানে—ওকি, তুমি কাঁদছ নাকি ?

ন্যায়সঙ্গত মীমাংসার অবকাশ না দিয়া মেয়েটি বিছানায় শুইয়া পড়িল এবং পাশ-বালিশ আঁকড়াইয়া মুখ ফিরাইয়া রহিল। ইহা দেখিয়া যুবকটিও বিছানায় বসিল এবং আকুলভাবে যে সব কাণ্ড করিতে লাগিল, তাহার বর্ণনা করিতে পারিব না। কারণ সেগুলি বর্ণনীয় নহে, অনুমেয়। মোট কথা, যুবকটির বাহাদুরি আছে

স্বীকার করিতে হইবে। কারণ, মিনিট দশেকের মধ্যেই সে পত্নীর মুখে হাসি ফুটাইয়া ছাড়িল। ঢাকা দেওয়া ভাত আহারান্তে পান চিবাইতে চিবাইতে যুবকটি যখন শয়ন করিল, তখন পত্নীর পতির গলা জড়াইয়া ধরিয়া বহুবারপৃষ্ট সেই প্রশ্নটি পুনরায় করিল, বল, তুমি আমাকে ছাড়া আর কাউকে ভালবাস না? কক্ষনও বাসবে না? কক্ষনও না?

অবিচলিতকণ্ঠে যুবক বহুবারপ্রদত্ত সেই উত্তরটি পুনরায় দিল, পাগল!

তোমার কমলদাকে বেশি ভালবাস, না আমাকে?

তোমাকে।

সত্যি বলছ?

সত্যি।

আমার চোখের দিকে চোখ রেখে বল তো।

যুবক তাহাই বলিল। অনর্থক সময় নষ্ট করিয়া লাভ নাই, তাহা ছাড়া ভোরে উঠিয়াই কমলদার কাছে যাইতে হইবে, কথা দিয়া আসিয়াছে। স্ত্রীকে সে যে ভালবাসে না, তাহা নহে, কিন্তু কমলদাকেও সে ভালবাসে। স্ত্রী কিন্তু অবুঝ, শঙ্কিতা, অভিমানিনী। ভালবাসার ক্ষেত্রে পুরুষ-প্রতিদ্বন্দ্বীও তাহার পক্ষে অসহ্য।

দৃশ্য পরিবর্ত্তিত হইল।

কয়েক বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে। স্বামীর প্রণয় একনিষ্ঠ কি না, সে প্রশ্ন করিবার আর অবসর নাই। যুবতীর কোলে শিশু। তাহাকে খাওয়ানো, নাওয়ানো, কাজল-পরানো, ঘুম-পাড়ানো, সাজানো-গোছানো—ক্ষুদ্র শিশুকে ঘিরিয়া নানা ব্যস্ততা, নানা

প্রয়োজন, নানা আয়োজন। তাহার অসুখে চিন্তা, সুখে আনন্দ। স্বামী আছে, অন্তরেই আছে, কিন্তু ঈষৎ অন্তরালে। স্বামীই এখন একমাত্র অবলম্বন নহে। শিশুপুত্রকে অবলম্বন করিয়া সুখ-স্বর্গ গড়িয়া উঠিয়াছে।

দৃশ্যের পর দৃশ্য আসিতেছে ও যাইতেছে। বিগত জীবন-নাট্যের দৃশ্যগুলি দ্রুতচ্ছন্দে যেন পুনরায় মানসপটে মূর্ত্ত ও বিলুপ্ত হইয়া গেল।

শিশু বড় হইতেছে। মায়ের কোল হইতে পাঠশালা—স্কুল—কলেজ। কিন্তু মায়ের কাছে সে এখনও শিশু। এখনও তাহার জামা, খাবার, এমন কি বই খাতা কাগজ পেন্সিল সব গুছাইয়া দিতে হয়। বড় হইলে কি হইবে, মা না হইলে এক দণ্ড চলে না। সর্ব্বদাই মা—মা। স্বামী? স্বামী পুরুষকারের আবর্ত্তে আবর্ত্তিত। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক ঘনিষ্ঠই আছে, কিন্তু সে ঘনিষ্ঠতা কবিত্বমূলক নহে, প্রয়োজনমূলক। এখন স্ত্রী স্বামীর কর্ত্তব্যপরায়ণা সহধর্ম্মিণী, প্রেমবিহ্বলা প্রণয়িনী নহেন। যুবক পুত্রই এখন তাহার নয়নের মণি। তাহাকে ঘিরিয়াই এখন যত স্বপ্ন, যত আশা আকাঙ্ক্ষা উদ্বেগ। তাহাকে সুখী করিবার জন্যই যত আকুলতা, তাঁহার আনন্দ-বিধানের জন্যই জননী-হৃদয় উন্মুখ।

জননীর আগ্রহাতিশয্যেই মহাসমারোহে পুত্রের বিবাহ হইয়া গেল। দেখা গেল, মণিকাঞ্চন-সংযোগ ঘটিয়াছে। বধূ শুধু রূপবতী নহে, গুণবতীও। আত্মীয়স্বজন সকলেই প্রফুল্লিত। ক্রমশ স্বাভাবিক নিয়ম-অনুসারে পুত্রের মন-মধুকরও রূপবতী গুণবতী বধূর চতুর্দ্দিকে

গুঞ্জন করিয়া ফিরিতে লাগিল। পত্নীই এখন তার সব। সেই তাহার কাপড় গুছাইয়া দেয়, তাহার খাবার লইয়া যায়, তাহার সর্ব্ব প্রয়োজনের ডাকে সাড়া দেয়। পুত্রের উৎসুক মন, আকুল নয়ন এখন যাহাকে অনুসন্ধান করিয়া ফেরে, সে জননী নহে, বধূ। বধূই এখন সব।

জননীর এখন প্রাণপণ চেষ্টা মুখের হাসিটুকু যেন বজায় থাকে। অনিবার্য্যভাবে তবু মাঝে মাঝে মেঘ দেখা দেয়।

চার

বাড়ির ভিতর গেলাম। শুনিলাম, গৃহিণী ঠাকুর-ঘরে। ধীর পদসঞ্চারে গিয়া দেখিলাম, ঠাকুরের সম্মুখে পট্টবস্ত্র পরিহিতা নারী উপুড় হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। পাথরের ঠাকুরকে ঘিরিয়া নানা উপচার—থরে থরে ফুল ফল নৈবেদ্য, ধূপধূনা নীরবে পুড়িতেছে, ঘৃতপ্রদীপের অকম্পিতা শিখা ঊর্দ্ধমুখিনী। নারী-হৃদয় একা থাকিতে পারে না। অবলম্বন চাই, আঁকড়াইয়া ধরিবার মত কিছু একটা চাই,—এমন একটা কিছু, যাহা চিরকাল তাহারই থাকিবে, অপর কাহারও হইবে না। রক্তমাংসে-গড়া নির্ম্মম মানুষ থাকে না, চলিয়া যায়। সে চিরপরিবর্ত্তনশীল, নিত্য নূতন নিগড় পরিতেছে ও ভাঙিতেছে। পাথরের দেবতা অনড়, অচল, অবিচলিত।

চিরন্তন প্রস্তর-দেবতার পদপ্রান্তে চিরন্তনী নারীকে অবনমিত দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। মানসপটে আবার সেই পুরাতন দৃশ্যটি ফুটিয়া উঠিল। তন্বী ষোড়শী স্বামীর গলা জড়াইয়া বলিতেছে, বল, তুমি আমাকে ছাড়া আর কাউকে ভালবাস না? কক্ষনও বাসবে না? কক্ষনও না?

নিবিড় পরিচয়

এক

যুগলবাবু লোকটিকে আগে অবশ্য চিনিতাম, অল্প দিন হইতে পরিচয় ঘনিষ্ঠতর হইতেছে। কিছুকাল পূর্ব্বে ভদ্রলোক সুগন্ধি কেশ-তৈলের ব্যবসায় করিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। এখনও সে প্রসিদ্ধি আছে, কিন্তু অধুনা গোপনে গোপনে (কেন যে গোপন করিতেছেন, জানি না) তিনি কেরোসিন তৈলের ব্যবসাতেও লিপ্ত হইয়াছেন শুনিতেছি। চোরাবাজারেও যাতায়াত আছে। রাই কুড়াইয়া একটি নয়, কয়েকটি বেলই তিনি বানাইয়াছেন—এইরূপ জনশ্রুতি। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় অর্থবান বলিয়া ভদ্রলোকের এতটুকু অহমিকা নাই, তাঁহার নিজের হৃদয় তো সর্ব্বদাই গলি-গলি করিতেছে, তাঁহার সংস্রবে যাঁহারা আসিয়াছেন, তাঁহারাও নিস্তার পান নাই, ইহাই তাঁহার বিশ্বাস।

আসিয়াই বলিলেন, একটা সিগারেট দিন।

দিলাম। সিগারেট ধরাইয়া ভদ্রলোক পকেট হইতে একতাড়া নানা রঙের খামের চিঠি টেবিলের উপর ফেলিয়া দিয়া বলিলেন, পঁচিশ জনের চিঠি ; বাড়িতে আরও অনেক আছে।

উল্টাইয়া উল্টাইয়া দেখিতে লাগিলাম। দেখিতে দেখিতে সহসা বক্তৃতা দিবার বাসনা প্রবল হইয়া উঠিল। এই বাই আমার কাছে এবং একবার চাগিলে রোধ করিবার ক্ষমতা নাই। সুতরাং সোৎসাহে বলিলাম, একটি বক্তৃতা দিব। শুনিবেন কি ?

সিগারেটে টান মারিয়া যুগলবাবু বলিলেন, নিশ্চয়। বলুন বলুন, আপনার কথা শুনিতে আমার বেশ লাগে।

হাঁটু দোলাইতে লাগিলেন। আমিও গলা-খাঁকারি দিয়া সুরু করিলাম, "দেখুন, পুরাকালে ফুলবাগানের সখ ছিল। সখ ছিল, কিন্তু সুবিধা ছিল না। যে বস্তু থাকিলে মানবের অধিকাংশ আধিভৌতিক অসুবিধাই বিদূরিত হয়, সেই বস্তুটিরই অভাব ছিল,—টাকা ছিল না! অল্প মাহিনায় সর্ব্বদিক রক্ষা করিয়া চলিতে হইলে যে সকল কলা কৌশল ক্ষুদ্রত্ব মহত্ত্ব-সরলতা-কপটতার চর্চ্চা করিতে হয়, আমাকেও সে সকল করিতে হইয়াছিল। দারুণ দুর্য্যোগের মধ্যে ফুটা সংসার-তরণীটাকে ময়ূরপঙ্খীর মত সাজাইয়া সগৌরবে যে বিদ্যার জোরে সেটি তীরস্থ করিয়াছি, তাহাকে ভোজবিদ্যা আখ্যা দিলে অসঙ্গত হইবে না। বাক্‌চতুর বাজিকর অন্যমনস্ক দর্শকের মূঢ়তার সুযোগ লইয়া যে ভাবে অসম্ভবকে সম্ভবপর করিয়া দেখায়, অধিকাংশ মধ্যবিত্ত গৃহস্থের মত আমিও সম্ভবত ভোজবিদ্যাবলে বলীয়ান হইয়াই সেই ভাবে বাহিরের ভড়ং বজায় রাখিতে সক্ষম হইয়াছিলাম। এই জাতীয় কোন একটা অঘটনপটিয়সী নিপুণতা না থাকিলে আমার স্বল্প আয় সত্ত্বেও শোভনতার মর্য্যাদা রক্ষা করিতে পারিতাম কিনা সন্দেহ। অর্থাৎ কোন নিমন্ত্রণ-বাড়িতে অথবা থিয়েটার-সিনেমায় গৃহিণীকে বেশবাস-অলঙ্কার-দৈন্যে কখনও বিন্দুমাত্র লজ্জিত হইতে হয় নাই, বাড়ির ভোজ-কাজে শাকভাজা চচ্চড়ি হইতে সুরু করিয়া লুচি, পোলাও, দইমাছ, মাছের কালিয়া, চিংড়িমাছের মালাইকারি, মাংসের কোর্ম্মা, কাটলেট, চপ, দ্বিবিধ ডাল, চাটনি, দই, পায়েস, রসগোল্লা, সন্দেশ, বুঁদিয়া, জিলাপি, পুডিং, কাস্টার্ড প্রভৃতি শালপাতার উপর থরে থরে সাজাইয়া হিন্দু, মুসলমান এবং খ্রীষ্টান

তিনটি সভ্যতারই মান-রক্ষা করিয়াছি, নিজের দরিদ্র আত্মীয় অথবা আত্মীয়াকে অকারণে কখনও কিছু কিনিয়া দিবার সামর্থ্য হয় নাই বটে, কিন্তু লৌকিকতা-ব্যাপারে ছোট নজরের পরিচয় দিয়াছি, অতি বড় শত্রুও এ কথা বলিতে দ্বিধা করিবে। সংক্ষেপে চিঠির ভাষা ও ভাব যেমনই হউক না কেন (তাহা লইয়া কেহ মাথা ঘামায় না), চিঠির কাগজ, বিশেষত চিঠির লেফাপা দ্বারা সকলকে সম্মোহিত করিতে প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছি। এই অসাধ্যসাধনের ইতিহাস একাধিক কুসীদজীবী মহাজনের খাতায় কড়ায় ক্রান্তিতে বিধিবদ্ধ হইয়া আছে।"

অভিভূত যুগলবাবুর হাঁটু-নাচানো বহুক্ষণ পূর্ব্বেই বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। এইবার সুযোগ পাইয়া তিনি কণ্ঠাগত প্রশ্নটিকে বাঙ্ময় করিলেন, "সবই বুঝিলাম, কিন্তু যাহা বলিলেন, তাহার সহিত আমার এই চিঠিগুলির সম্পর্ক কি ?"

"সম্পর্ক কিছুমাত্র নাই। বক্তৃতা দিতে হইলে অবান্তর কথা দুই-চারিটা অনিবার্য্য ভাবেই আসিবে, উহাতে কিছু মনে করিবেন না। আসল কথা, ফুলবাগানের সখ ছিল। কিন্তু তখন সমাজের যে স্তরে বিরাজ করিতাম, সে স্তরে এ সখের মূল্য কেহ দিত না, সুতরাং ইহার জন্য অর্থ ব্যয় করিতে সঙ্কুচিত হইতাম। দামী জুতা, শাল, গহনা অথবা শাড়ীর জন্য অর্থ জুটাইতে হইত, কারণ সেগুলি প্রতিবেশীগণের অন্তরে শ্রদ্ধা সম্ভ্রম এবং হিংসার উদ্রেক করিয়া বিচিত্র পদ্ধতিতে আমাদের সুখোৎপাদন করিত। সংক্ষেপে ফুলবাগানের জন্য উদ্বৃত্ত বিশেষ কিছু থাকিত না, এবং উঠানের এক কোণে অপরের নিকট হইতে চাহিয়া আনা কয়েকটি ফুলগাছ পুঁতিয়া সসঙ্কোচে মনের সখ মিটাইতাম। আমার সেই নগণ্য বাগান কোন লোকের

প্রশংসা আকর্ষণ করিতে সমর্থ হয় নাই বটে, কিন্তু সে যুগের আমার লেফাপালাঞ্ছিত জীবনে উঠানের সেই ছোট বাগানটুকুই আমার প্রাণের সত্যকার আশ্রয় ছিল। ওইটুকুর মধ্যেই কোন লেফাপা ছিল না। বস্তুত সেই ছোট বাগানটিকে আজও আমি ভুলি নাই। সর্ব্বসমেত বোধ হয় গুটি দশেক গাছ ছিল, কিন্তু প্রত্যেক গাছের প্রত্যেক পাতাটি আমি চিনিতাম। প্রতি গাছের প্রতি ফুলটির উন্মেষ হইতে অবসান পর্য্যন্ত লক্ষ্য করিতাম। কোন্ গাছে কখন কুঁড়ি হইল, কুঁড়িটি কতদিনে ফুটিয়া ফুল হইল এবং তাহার পর ক্রমে ক্রমে কেমন করিয়া ঝরিয়া পড়িল—কিছুই আমার দৃষ্টি এড়াইত না। প্রত্যেক গাছের প্রতিটি আচরণ সাগ্রহে দেখিতাম। মনে হইত, উহাদের ভাষা যেন আমি বুঝি। প্রথম যেদিন গোলাপ গাছটায় কুঁড়ি হইল, সেদিনের কথা এখনও আমার বেশ মনে আছে। মনে হইয়াছিল, গোলাপ গাছটার ডালে ডালে পাতায় পাতায় বেশ যেন একটু অহঙ্কার ফুটিয়াই উঠিয়াছে, বাতাসে দুলিয়া দুলিয়া যেন বলিতেছে, কেমন কুঁড়ি হইয়াছে, দেখিতেছ তো!

সেই ফুল ফুটিয়া যখন ঝরিয়া গেল, তখন তাহার নীরব শোকও আমি প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম। তাহার পর দ্বিতীয় ফুলটি যখন ফুটিল, তখন তাহারও মুখে আবার হাসি ফুটিল বটে, কিন্তু তাহা বিষণ্ণ, সশঙ্ক। ফুল ফোটে, ফুল ঝরে। প্রতিদিন দুই একটি ফুল ফুটিত, দুই একটি ঝরিত। প্রতি গাছটির হাসিকান্না আমি শুনিতে পাইতাম। আমার বাগান নগণ্য ছিল বটে, কিন্তু তাহাতেই আমি তন্ময় হইয়া থাকিতাম।

যুগলবাবু ভ্রূযুগল কুঞ্চিত করিয়া একবার আমার প্রতি চাহিলেন। একটু থামিয়া আমি পুনর্ব্বায় সুরু করিলাম, "তাহার পর অনেকদিন

কাটিয়া গিয়াছে। আমার প্রথম জীবনের অর্থকৃচ্ছ্রতা আর নাই। বাগান বড় করিবার মত আর্থিক সঙ্গতি হইয়াছে এবং সত্য সত্যই বাগানকে বিস্তৃত করিয়াছি। এখন আমার বাগানখানা ভাল করিয়া পর্য্যবেক্ষণ করিতে হইলে অন্ততপক্ষে একবেলা কাটিয়া যায়। অনেকখানি জমি, অনেক রকম যন্ত্র, অনেক রকম গাছ, অনেকগুলি মালী জুটাইয়া বাগানের খ্যাতি বাড়াইয়াছি। আভিজাত্যগর্ব্বিত বহু দুর্লভ ফুল আমার বাগান আলো করিতেছে, কিন্তু আমার সেকালের সেই ছোট বাগানের শীর্ণ গাঁদা, কীটদষ্ট গোলাপ, অপরিপুষ্ট মল্লিকা, আলোকবঞ্চিত রজনীগন্ধাকে আজিও ভুলি নাই। তাহাদের যত ভালবাসিতাম, ইহাদের তত ভালবাসি না। ইহাদের আমি চিনিই না। এই ভিড়ের সহিত আমার প্রাণের পরিচয় নাই। সহস্র সহস্র ফুল রোজ ফুটিতেছে ও ঝরিতেছে, খবর রাখা আর সম্ভবপর নহে। ইহাদের সকলের কুল, গোত্র, বংশপরিচয়, বৈশিষ্ট্য অবশ্য অনর্গল বলিয়া যাইতে পারি। আপনিও পারিবেন, কারণ যে কোন ভাল ক্যাটালগে তাহা আছে। শুধু ফুল কেন, বইয়ের কথাই ধরুন না। সেকালে যখন বই কিনিবার ক্ষমতা ছিল না, অপরের বই চাহিয়া অথবা চুরি করিয়া যখন পড়িতে হইত, তখন কি আগ্রহেই না পড়িতাম! প্রত্যেকটি পুস্তকের সহিত, প্রতি পুস্তকের প্রতি পাতাটির সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটিয়াছিল। এখন নিজের লাইব্রেরি প্রকাণ্ড, প্রতি মাসে নানা দেশের বিখ্যাত লেখকদের বই কেনা হইতেছে, কিন্তু সে আগ্রহ তো আর নাই। আলমারিতে সারি সারি বই জমিতেছে, অধিকাংশ পুস্তকেরই বাহিরের সৌষ্ঠব দেখিয়া তৃপ্ত হইতেছি, হয়তো দুইএকখানা খুলিয়া দুই-চারিপাতা উল্টাইতেছি, উহাদের সম্বন্ধে দুই-চারিটা ধার-করা জ্ঞানগর্ভ বুলিও হয়তো

আওড়াইতে পারি, কিন্তু সত্য কথা বলিতে হইলে বলিতে হয়, ইহাদের কাহাকেও আমি চিনি না। যাহাদের চিনি বহুপূর্ব্বেই তাহাদের চিনিয়াছি। নূতন করিয়া চিনিবার আগ্রহ আর নাই। এখন যাহা আছে, তাহা সংগ্রহ করিবার আগ্রহ।"

যুগলবাবু অধীর হইয়া উঠিয়াছিলেন। বলিলেন, "এ চিঠিগুলোর সম্বন্ধে কি বলিতে চান?"

"বলিতে চাই, আপনার বাগান অথবা লাইব্রেরিটি মন্দ নয়। ইংরেজী ভাষায় যাহাকে বলে, এ গুড কালেক্‌শন! শত বাধাসত্ত্বেও কখনও লুকাইয়া কাহাকেও যদি ভালবাসিয়া থাকেন (বাসিয়াছেন কি না জানি না), তাহা হইলে সেই একমাত্র ভালবাসা যাহা সত্য এবং তাহাকে যদি আপনি সত্য-মর্য্যাদা না দিয়া থাকেন ঠকিয়া গিয়াছেন।

বাকিগুলি?

বাকিগুলি আপনার অর্থ, খ্যাতি অথবা রূপের টানে স্বতই জুটিয়াছে অথবা আপনি জুটাইয়াছেন। বলিলাম তো, গুড কালেক্‌শন। কিন্তু উহারা আমার বর্ত্তমান বাগানের ফুলের মত। আয়ত্তের মধ্যে থাকিয়াও অনায়ত্ত।

কেন?

আসল কথা কি জানেন, আমরা যতই বড়াই করি না কেন, আমাদের প্রাণ সত্যই এত বড় অথবা মজবুত নহে যে, 'একাধিক নিবিড় পরিচয়ের ধাক্কা সামলাইতে পারে। সত্যকার প্রেম বড় সঙ্গীন বস্তু। অধিকাংশ লোকের জীবনে তাহা আসেই না। কিন্তু মজা এই যে, অধিকাংশ লোকই একাধিক রমণীর সংস্পর্শে আসিয়া মনে করেন, তাহাদের প্রত্যেকেরই আদিঅন্ত তিনি নখদর্পণে দেখিতে

পাইয়াছেন। আসলে আমরা প্রায় সকলেই দরিদ্র দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা, পিটুলিগোলা পান করিয়া উদ্বাহু হইয়া নৃত্য করিতেছি।

এই পর্যন্ত বলিয়া সহসা অত্যন্ত দমিয়া গেলাম। সহসা মনে পড়িয়া গেল, প্রাণকান্তের নির্ব্বন্ধাতিশয্যে সন্ধ্যাবেলায় এক গ্রাস সিদ্ধি পান করিয়াছি। বিবেকের ধমকে কণ্ঠরোধ হইয়া গেল। বার দুই ঢোঁক গিলিলাম। যুগলবাবু বলিলেন, দিন মশাই, আর একটা সিগারেট দিন।

দিলাম।

যুগলবাবু সিগারেটটি ধরাইয়া সন্দিগ্ধভাবে আমার প্রতি চাহিতে লাগিলেন। আমার মনে হইতে লাগিল, আহা, লোকটি মানুষ না হইয়া যদি গাছ হইত, বাগানে পুঁতিয়া রাখিতাম।

অবচেতনা
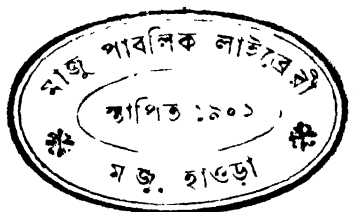
এক

বহুকাল পরে একটি বাল্যবন্ধুর সহিত দেখা হইল এবং বহুকাল পরে প্রাণ ভরিয়া তাহার সহিত আলাপ করিয়া ভারী আরাম বোধ করিলাম। কিন্তু সেই আরামজনক কথাগুলি যদি আপনাদের বলি, আপনারা কেহ হয়তো বিস্মিত হইবেন, কেহ বিস্মিত হইবার ভান করিবেন, কাহারও নাসা হয়তো কুঞ্চিত হইয়া উঠিবে। হওয়াই উচিত, কারণ যে আলাপগুলি করিলাম, তাহা ধর্ম্ম দর্শন বিজ্ঞান অথবা সমাজনীতি-বিষয়ক তো নহেই, উপরন্তু দুর্নীতিমূলক, সামাজিক কর্ণগোচরযোগ্য নহে। আমার পুত্র অথবা পুত্রস্থানীয় কেহ এরূপ আলোচনা করুক, তাহা আমি চাহি না। নিজে কিন্তু করিয়া ভারী তৃপ্তি পাইলাম। অনেকদিন পরে মনটা যেন খোলসা হইয়া গেল।

সকলের নাসাই যে কুঞ্চনপ্রবণ নহে, তাহা জানি ; আমি বাল্য-বন্ধুটির সহিত কি আলোচনা করিলাম, তাহা জানিবার জন্য অনেকেই হয়তো উৎসুক হইয়া উঠিয়াছেন, বুঝিতে পারিতেছি ; কিন্তু কি করিব, উপায় নাই। সংস্কারে বাধিতেছে। এখনও জামা কাপড় পরিয়া রাস্তায় বাহির হই, লুটবিহারী-মুখনিঃসৃত অশ্লীল বচনগুলি অনাবৃতভাবে লিখিয়া ফেলিবার মত সৎসাহস সংগ্রহ করিতে পারিলাম না। লেখা দূরে থাকুক, সকলের নিকট সে কথাগুলি বলিতেও বাধিবে। ইহা কিন্তু মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেছি যে, সকলের কাছে বলিতে না পারিলেও কথাগুলি শুনিয়া পুলকিত

হইয়াছি। পুলকিত হইয়া লজ্জা অনুভব করিতেছি না এই কারণে যে, আমি জানি, অন্তরঙ্গ বন্ধুর নিকট অশ্লীল কথা বলিয়া অথবা শুনিয়া (অথবা তুইই করিয়া) যাঁহারা পুলকিত হন, তাঁহারা সংখ্যায় নিতান্ত অল্প নহেন। একটা জিনিস লক্ষ্য করিয়াছেন কি ? আমরা যাহাদের সহিত অশ্লীল প্রসঙ্গ করিতে পারি, তাহারা আমাদের নিতান্ত অন্তরঙ্গ। অতিশয় শ্লীল ভদ্রব্যবহার সম্ভ্রমপূর্ণ শিষ্টাচার সঙ্গত, কিন্তু তাঁহাদের আমরা বৈঠকখানা হইতেই বিদায় করি। অন্তরলোকে স্থান দিই তাহাদের, যাহাদের নিকট আমরা আবরণ উন্মোচন করিতে পারি। অধিকাংশ লোকের নিকট মন এবং মুখ খোলা চলে না তাহা সত্য ; কিন্তু যাহাদের নিকট খোলা চলে, তাহারা অন্তরঙ্গ, এ কথাও সত্য। সমাজে উলঙ্গ হইয়া বিচরণ করা সুরুচির পরিচয় নহে তাহা ঠিক ; কিন্তু যে স্থানে আমরা অসঙ্কোচে উলঙ্গ হইতে পারি (যথা, বাথরুম) তাহা যে আমাদের অতিশয় প্রিয় স্থান, তাহাতে সন্দেহ নাই। প্রিয় স্থান বলিতে যদি কাহারও আপত্তি থাকে, 'প্রয়োজনীয় স্থান' বলিলে, আশা করি, তিনি প্রতিবাদ সম্বরণ করিবেন। যাহা প্রয়োজনীয় তাহাই প্রিয় কি না, অনায়াসেই এ বিষয়ে খানিকক্ষণ বাগ্‌বিস্তার করা চলে, সুযোগও আসিয়াছে, তথাপি কিন্তু নিরস্ত হইলাম। আপনাদের প্রতি অনুকম্পাবশত নহে, বর্ত্তমান বিষয়টিই বর্ত্তমানে আমার মস্তিষ্ককে গ্রাস করিয়া রাখিয়াছে। যাহাদের সহিত অশ্লীল আলোচনা করি, তাহারা আমাদের প্রিয় কেন—এই চিন্তাই এখন চিত্তকে আলোড়িত করিতেছে। ভাবিতেছি, নুটবিহারীর আর তো কোন গুণ নাই, গুণের মধ্যে সে অনর্গল খারাপ কথা বলিয়া যাইতে পারে। শুধু তাহাই নয়, এমনই তাহার শক্তি যে, খানিকক্ষণ তাহার সাহচর্য্যে

থাকিলে অন্তর্নিহিত অশ্লীলতাকে সে টানিয়া বাহির করিয়া আনে এবং কিছুক্ষণ পরে সবিস্ময়ে লক্ষ্য করি, আমিও নিখাদ বৈদিক ভাষা পুরাদমে ব্যবহার করিতেছি। ভারী ভাল লাগে। কিন্তু কেন?

দুই

সভ্যতার ভাঁওতায় একটা কথা আমরা অহরহ ভুলিয়া যাই যে, আমরা পশু। যে কোন পশুর মতই আমাদের পাশবিক প্রয়োজন আছে অর্থাৎ যে কোন পশুর মতই আহার-নিদ্রা-মৈথুন-প্রবৃত্তি মর্ম্মান্তিক-ভাবে আমাদের মজ্জাগত। ইহাও বিস্মৃত হইলে চলিবে না যে, এই প্রবৃত্তিত্রয়কে নানা ভাবে প্রশমিত করিবার প্রচেষ্টাই বস্তুতান্ত্রিক সভ্যতা। বর্ত্তমান সভ্যতার উজ্জ্বল শিখা যে প্রবৃত্তির তৈলেই জ্বলিতেছে, তাহা মনে রাখিলে অনেক অকারণ ক্ষোভের হাত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। আদিম অসভ্য মানুষ সমাজসৃষ্টিও করিয়াছিল এই প্রবৃত্তিরই বশে। পরস্পর মারামারি কাটাকাটি না করিয়া যাহাতে মনুষ্যনামধেয় পশুগুলি সুখে-স্বচ্ছন্দে তাহাদের আদিম প্রবৃত্তিগুলির চর্চ্চা করিতে পারে, অন্যান্য প্রাণী হইতে আত্মরক্ষা করিয়া নিছক প্রাণী হিসাবেই যাহাতে তাহারা বাঁচিতে পারে, সমাজ এবং সমাজনীতি সৃষ্টি করিয়া মানুষ সেই ব্যবস্থাই করিয়াছিল। কিন্তু প্রত্যেক ব্যবস্থার মধ্যেই সেই ব্যবস্থাকে অব্যবস্থিত করিবার বীজ নিহিত থাকে। সামাজিক নীতির মধ্যেই সামাজিক দুর্নীতির বীজও নিহিত ছিল। সামাজিক নিয়ম অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ব্যক্তিগত স্বাধীনতাকে ক্ষুণ্ন করে। সমগ্র সমাজের কল্যাণের জন্য প্রস্তুত সামাজিক বিধানগুলি ব্যক্তিনিরপেক্ষ এবং সেইজন্যই ব্যক্তির

বিকাশের অথবা আনন্দের পক্ষে সকল সময়ে অনুকূল নহে। আরও মুস্কিল এই যে, প্রত্যেক ব্যক্তির প্রবৃত্তি মূলত এক হইলেও একেবারে এক নহে। আহার-নিদ্রা-মৈথুন বিষয়ে প্রত্যেকেরই স্বকীয় বৈশিষ্ট্য আছে। ব্যক্তিও যত, বৈশিষ্ট্যও তত। কোন একটা নিয়মে তাহাদের স্ফূর্তি হয় না এবং স্ফূর্তি না হইলে সমাজে নিত্যনূতন সমস্যার আবির্ভাব হয়। প্রত্যেক মানুষ আহার-নিদ্রা-মৈথুন বিষয়ে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিবার জন্যই সততই উন্মুখ; বস্তুত উহা রক্ষা করিতে না পারিলে সে সুখী হয় না এবং ঐ সুখটুকু লাভ করিবার জন্য সে সমাজের প্রচলিত নিয়ম ভঙ্গ করিতে দ্বিধা করে না। আসলে সে নিজেকেই মানে, নিয়মকে নয়! অসুখের সময় নিষিদ্ধ আহারের জন্য মন প্রলুব্ধ হইয়া উঠে, ট্রেনে ভিড় হইলে বেশি করিয়া ঘুম পায়, চুরি করিয়া খাইতে অথবা অভদ্রতা করিয়া ঘুমাইতে আমরা বিন্দুমাত্র ইতস্তত করি না। আহার এবং নিদ্রার কথায় একটা কথা মনে হইতেছে। আহার এবং নিদ্রা বিষয়ে সমাজ যতটা উদার, মৈথুন বিষয়ে ততটা নয়। যাহা খুশি আহার করিয়া যেখানে খুশি নিদ্রা দিলে আজকাল খুব একটা গুরুতর অপরাধ হয় না। মৈথুন বিষয়ে 'যাহা খুশি' প্রবৃত্তিটা আছে, কিন্তু 'যাহা খুশি' স্বাধীনতাটা নাই। স্বাধীনতা না থাকিবার আরও একটা সঙ্গত কারণ আছে। আহার এবং নিদ্রার উপকরণ মানুষ নহে, কিন্তু মৈথুনের উপকরণ মানুষ। সুখ-দুঃখ-ইচ্ছা-অনিচ্ছা-বিবেচনা-বিশিষ্ট একটা মানুষকে লইয়া যথেচ্ছ ব্যবহার করা চলে না। সুতরাং উদারতম সমাজেও এ ব্যাপারে কিছু না কিছু বিঘ্ন চিরকালই থাকিবে—'যা খুশি' চলিবে না, কারণ অপর পক্ষেরও 'যা খুশি' আছে। সেটা না মানিয়া উপায় নাই। স্বপ্ন এবং লুটবিহারী সুতরাং অনিবার্য্য।

পুরুষেরা স্ত্রীলোকদের সম্বন্ধে এবং স্ত্রীলোকেরা পুরুষদের সম্বন্ধে চিরকালই গোপনে অনিবার্য্যভাবে আলোচনা করিবে এবং সব সময় তাহা যে শ্লীলতার সীমা মানিয়া চলিবে, তাহা বলিবার মত মিথ্যাপটুতা আমার নাই। যাহারা এই সীমা লঙ্ঘনের সঙ্গী, তাহাদের মধ্যে অন্তরঙ্গতা স্বাভাবিক, কারণ অমোঘ প্রবৃত্তির সূত্রই তাহাদের বন্ধন। সীমা লঙ্ঘন করিয়া তাহারা প্রচলিত বিধান অমান্য করিতেছে বলিয়া এই বন্ধন আরও দৃঢ় এবং মধুর। বাল্যকালে নিস্তব্ধ দুপুরে গুরুজনদের নিদ্রার সুযোগে চুপি চুপি আচার চুরি করিয়া যাহার সহিত চাখিয়া চাখিয়া তাহার রসাস্বাদন করিতাম, যে নিয়ম অনুসারে সে আমার অন্তরঙ্গ ছিল, নুটবিহারীও সেই নিয়ম অনুসারে আমার অন্তরঙ্গ। যাহারা প্রতিভাবান এবং প্রবল, তাহারা স্বকীয় শক্তিবলে সমাজের বুকের উপর বসিয়া ঢাকঢোল বাজাইয়া সগর্ব্বে খোলাখুলিভাবে ব্যক্তিত্ব-বিরোধী সামাজিক আইনকে অমান্য করে, আমাদের মত দুর্ব্বলেরা করে লুকাইয়া। আমরা অ্যালেক্‌জাণ্ডারের দলে নই, রবারের দলে। কিন্তু আইন অমান্য আমরা সবাই করি, করিয়া সুখ পাই বলিয়াই করি। নিরঙ্কুশভাবে পাশব প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য সমাজের যেমন প্রয়োজন, অচরিতার্থ ব্যক্তিগত পশুপ্রবৃত্তিকে ভাষা দিবার জন্য নুটবিহারীও তেমনই প্রয়োজন। বিশ্বের অন্যান্য প্রাণীগণের প্রকোপ হইতে আত্ম-রক্ষা করিবার জন্য আমরা দলবদ্ধ হইয়া যেমন সমাজ গড়িয়াছি. তেমনই সমাজের প্রকোপ হইতে নিজেকে মুক্তি দিবার জন্য নুটবিহারীকে আবিষ্কার করিয়াছি। অর্থাৎ যেখানে মানুষ পশু, সেখানেই তাহার দল চাই, সঙ্গী চাই, সমাজ চাই, নুটবিহারী চাই। যেখানে সে পশুত্বকে অতিক্রম করিয়াছে, সেখানে সে একক।

আর কতটা বাকি ?

প্রিয়বন্ধু প্রাণকান্ত নিঃশব্দে কখন পিছনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন, বুঝিতে পারি নাই। দেখিলাম, তাঁহার চক্ষু দুইটি কৌতুকে নাচিতেছে। লজ্জিত মুখে লেখনী সম্বরণ করিয়া বলিলাম, ব'স।

উপবেশনান্তে প্রাণকান্ত বলিলেন, দেখি।

খাতাখানা দিলাম।

কিছুক্ষণ নীরবে কাটিল। উপরোক্ত প্রবন্ধটি অদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া স্মিতমুখে তিনি মন্তব্য করিলেন, বেশ কায়দা করিয়া ভিন্ন পথ ধরিয়াছ দেখিতেছি। আমি মনে করিয়াছিলাম, নৃত্যের উপকারিতা বা চমৎকারিতা সম্বন্ধে কিছু লিখিতেছ বুঝি।

মানে ?

প্রাণকান্ত বলিলেন, কাল রাত্রে নাচ দেখিবার পরই যে তোমার অবচেতন মন নুটবিহারীকে খাড়া করিয়াছে, তাহা তো পরিষ্কার বোঝা যাইতেছে। নটীর নৃত্যঘটিত আঙ্গিক অশ্লীলতাকে তুমি নুটবিহারীর চিত্তঘটিত বাচনিক অশ্লীলতায় রূপান্তরিত করিয়াছ। মন্দ হয় নাই।

আরে না না, কি যে বল তুমি !

প্রাণকান্ত নীরবে মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন। তাহার পর বলিলেন, মেয়েগুলি নাচে ভালই। আমি তো ঘণ্টাখানেক পরে উঠিয়া আসিলাম, তুমি কতক্ষণ ছিলে ?

শেষ পর্য্যন্ত।

প্রাণকান্ত আর একটু হাসিলেন।

অতি আধুনিকতা

এক

সম্মুখের বৃদ্ধ বটগাছটায় নব পত্রোদ্গম হইয়াছে। কচি কচি সবুজ পাতায় সমস্ত গাছটা ভরা। বৃদ্ধ গাছের শাখায় শাখায় অতি-আধুনিকতার বিজয়-নিশান উড়িতেছে। একটুও বিসদৃশ মনে হইতেছে না, বরং ভালই লাগিতেছে। মানুষের অতি-আধুনিকতায় কেমন যেন একটা ডেঁপোমির গন্ধ থাকে, গাছের অতি-আধুনিকতায় তাহা নাই। অনাবশ্যক আতিশয্যে তাহা ভারাক্রান্ত নহে, সহজ সরল সুস্থ অভিব্যক্তি। অতি-আধুনিক মানব-মানবী কিম্ভূতকিমাকার জীব। অদ্ভুত ধরণের কাছা কোঁচা শাড়ি পাজামা, বিচিত্র ঢঙের শেমিজ কামিজ ব্লাউজ পাঞ্জাবি, নানা ছাঁটের গোঁফ দাড়ি চুল ভাষা ভঙ্গি—অভূতপূর্ব্ব একটা জগা-খিচুড়ি। স্বাতন্ত্র্য-প্রকাশের এই গা-জ্বালানো জবরদস্তি চুলে হেঁচকা টান মারিয়া চোখে খোঁচা দিয়া যেন বলে, দেখ না বাপু, একবার আমার দিকে চাহিয়া দেখ। সমস্ত চিত্ত বিরূপ হইয়া উঠে। তাহার মধ্যে ভালও যদি কিছু থাকে, তাহাও স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হই। ওই বুড়ো গাছটা কচি কচি সবুজ পাতায় সাজিয়াছে, একটুও তো খারাপ লাগিতেছে না, বরং উহার স্নিগ্ধশ্যামল রূপ দেখিয়া চোখ জুড়াইয়া যাইতেছে।

ভাবিতেছি, কেন এমন হয়? গাছের অতি-আধুনিকতা এত সুশ্রী, মানুষের অতি-আধুনিকতা এত বিশ্রী কেন? গাছের মত

মানুষও তো প্রাণের তাগিদেই নিজেকে প্রকাশ করে। মানুষের প্রকাশ এমন শ্রীহীন হয় কেন ?

দুই

চিন্তা করিতে গিয়া প্রথমেই একটা সমস্যায় পড়িয়াছি। আরও মুস্কিল এই যে, সমস্যার সমাধান সহজ বলিয়া মনে হইতেছে না। কোন বিষয়ে সম্যকরূপে চিন্তা করিতে গেলে এমন মুস্কিলে পড়িতে হয়! গাছের অতি-আধুনিকতা কেন সুন্দর, তাহা চিন্তা করিতে বসিয়া হঠাৎ মনে হইতেছে, আমরা তো অপরের সব কিছুই সুন্দর দেখি। পরের স্ত্রী, পরের বাড়ি, পরের গাড়ি, পরের চেহারা, পরের সভ্যতা, পরের সব কিছুই আমাদের চোখে নিজের সব কিছুর অপেক্ষা সুন্দরতর। সমস্ত মানবজাতিটাই প্রলুব্ধ নয়নে পরের দিকে চাহিয়া আছে। গাছ, পাখী, প্রজাপতি—অর্থাৎ যে সব জিনিস লইয়া আমরা কবিত্ব করি—তাহারা একেবারে অন্য পর্য্যায়ের জীব—চরম পর। সেইজন্যই কি ইহাদের সম্বন্ধে আমাদের মোহ এত প্রবল? একটা গাছ আর একটা গাছ সম্বন্ধে হয়তো ততটা উচ্ছ্বসিত নহে, তাহারা হয়তো নিজেদের অতি-আধুনিকতা লইয়া মর্ম্মর-ভাষায় পরস্পরকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে এবং আমাদের ছাঁটা গোঁফ, লম্বা জুলফি দেখিয়া মুগ্ধ হয়। কে জানে! পাখীরাও হয়তো তাই।

হয়তো-মূলক এই সম্ভাবনাটা উপেক্ষণীয় নহে। কিন্তু ইহাও ঠিক, কেবল এইটাকে আঁকড়াইয়াই স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিতে পারিব না! আমাদের প্রত্যেকেরই জীবনে হয়তো-সৃষ্ট একটা প্রকাণ্ড

স্বপ্নলোক আছে, কিন্তু আমরা সে স্বপ্নলোকে বেশীক্ষণ থাকিতে পারি না; কল্পনা-কুহেলিকায় মন দিশাহারা হইয়া পড়ে। আমরা 'নয়তো' বলিয়া সেখান হইতে পলাইয়া আসি এবং বাস্তবলোকের কঠিন ভূমিতে দাঁড়াইয়া একটা স্পষ্ট কিছুকে আশ্রয় করিতে চাই।

এ সম্বন্ধে সুতরাং একটা 'নয়তো', খাড়া করা দরকার।

তিন

চিন্তা করিতেছিলাম।

দৌহিত্র আসিয়া প্রবেশ করিলেন এবং বক্র কটাক্ষে আমার পানে চাহিয়া বলিলেন, দাদু, আবার তুমি বালিশটাকে কনুই দিয়ে অমন করে ঠেসছ! ফের ফেটে যাবে। কালই তো দিদি সেলাই ক'রে দিলে।

অপ্রস্তুত মুখে উঠিয়া বসিলাম।

এই ছোকরাই কয়েক বৎসর পূর্ব্বে আমার তাকিয়ার উপর উলঙ্গ হইয়া তাণ্ডবনৃত্য করিত এবং তাকিয়া সামলাইতে আমাকেই গলদ-ঘর্ম্ম হইতে হইত। সেই এখন আমাকে তাকিয়া সম্বন্ধে সচেতন করিয়া ধমকাইতেছে। চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে—।

তাকিয়া-প্রসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া তাহার বাটারফ্লাই গোঁফের দিকে চাহিয়া বলিলাম, অমন সুন্দর গোঁফ জোড়াকে বেঁড়ে করেছিস কেন বল তো?

এই তো সুন্দর।

সুন্দর! কিসে সুন্দর?

ঝোলে না। তোমাদের গোঁফ তো দিনরাত ঝুলেই আছে।

কুকুরের লেজ কাটলে কুকুর তেজী হয় শুনেছি, গোঁফও হয় নাকি ?

মুচকি হাসিয়া দৌহিত্র চলিয়া গেলেন।

ঝোলে না! গোঁফটাকে অহরহ সমুচ্চত রাখাই হয়তো পৌরুষের লক্ষণ কিন্তু বাহিরের গোঁফ উচাইয়া রাখিলে কি হইবে, মনের গোঁফ যে বারম্বার ঝুলিয়া পড়িতেছে। ভায়া বোধ হয় সে খবর এখনও পান নাই। মনের গোঁফ এখনও উঠে নাই সম্ভবত। যতদিন না উঠে, ততদিনই ভাল। ও বাড়ির টুনটুনির সহিত ঘনিষ্ঠতা হওয়ার পর হইতেই ভায়ার প্রসাধনের নানা বৈচিত্র্য দেখিতে পাইতেছি। শুই ত রোগা লিকলিকে চেহারা, কেবল গোঁফ ছাটিয়াই যদি কেল্লা ফতে করিতে পারে, তাহা হইলে আজকাল ব্যাপার সহজ হইয়া গিয়াছে বলিতে হইবে।

আধুনিক বিজ্ঞানের মতে যৌবনের (এমন কি বার্দ্ধক্যেরও) সমস্ত সাজ-সজ্জার মূলে আছে যৌন-প্রবৃত্তি। পুরুষেরা নারীদের এবং নারীরা পুরুষদের প্রলুব্ধ করিবার জন্য দিগ্বিদিক-জ্ঞানশূন্য হইয়া ধোপা, নাপিত, দরজী এবং মনিহারি দোকানের শরণাপন্ন হইতেছে। ধোপা নাপিত দরজী এবং মনিহারি দোকান পরিবর্ত্তনশীল কালের সহিত তাল রাখিয়া মাল সরবরাহ করিতেছে। সেকালের রুচি একালের রুচি এক নয়। পূর্ব্বে আলতা, ঘোমটা, মল, নোলক আমাদের কল্পনাকে আবিষ্ট করিত, আজকাল হাই-হীল জুতা, স্কন্ধকাটা জামা, চুনকাম-করা মুখ, হলব-করা শাড়ি না দেখিলে কল্পনা ভিজিতে রাজি হয় না। শ্রোণীভারাদলসগমনা আজকাল আমাদের আদর্শ নয়, আজকাল চাই স্মার্ট তন্বী। স্কিপিং রোপ কিনিয়া ঘরে-

বাহিরে তাই লাফালাফি সুরু হইয়াছে। অর্থাৎ চাহিদা অনুসারে সকলে চলিতেছে।

চাহিদার নিত্যনূতন রূপ এবং তাহাই অতি-আধুনিকতার জনক কিম্বা জননী (ব্যাকরণটা ঠিক করিতে পারিতেছি না)।

কিন্তু আমার প্রশ্ন, চাহিদা বদলায় কেন? জীব-জগতের অন্য কোথাও তো চাহিদা বদলায় নাই। আজও ময়ূর ঠিক তেমনই ভাবে পেখম মেলিয়া ময়ূরীকে মুগ্ধ করিতেছে, যেমন সে আগে করিত। পেখম ছাঁটিবার অথবা পেখমের উপর নূতন রকম রঙ ফলাইবার তো তাহার দরকার হয় নাই। সনাতন পেখম মেলিয়া সনাতন পদ্ধতিতেই সে ময়ূরীকে মুগ্ধ করিতেছে। মানুষের বেলাতেই নিত্যনূতন ভজকট কেন?

চার

প্রকৃষ্টরূপে চিন্তা করার পর মনে হইতেছে, ভজকট না হইলেই বিস্ময়কর হইত। যে নিঃস্ব, যে দেউলিয়া, সে বিপন্ন হইবে না তো কে হইবে? আমাদের তো কিছুই নাই। একদা আমাদেরও একটা নিজস্ব পেখম ছিল বটে, কিন্তু তাহা তো বহুকাল পূর্ব্বেই আমরা নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছি। আমাদের সে স্বাভাবিক সুস্থ রূপ আর নাই। বর্ত্তমানে মোটা রোগা নানাভাবে বিকৃত কদর্য্য যে জীবগুলি মনুষ্য নামে পরিচিত, তাহাদের বহিরাবরণ না হইলে চলিবে কেন? নিজেদের যে কিছু নাই। এই বীভৎস নগ্নতাকে কোন একটা কিছু দিয়া আবৃত করা আত্মরক্ষার জন্যই প্রয়োজন। উলঙ্গ নিরাভরণ হইয়া কিছুক্ষণ আমরা যদি পরস্পরের দিকে চাহিয়া থাকি,

মুগ্ধ হওয়া দূরে থাক, খুন চাপিয়া যাইবে, উন্মত্ত হইয়া পরস্পর পরস্পরকে খুন করিয়া ফেলিব। প্রকৃতিদত্ত সুন্দর পেখম হারাইয়া ফেলিয়া ঝুটা পেখমের সন্ধানে তাই আমরা ঘুরিয়া বেড়াইতেছি। কারণ, পেখমবিহীন জীবন অসম্ভব। সুতরাং বাজারে যখন যেটা পাওয়া যায় ধার করিয়া, ভিক্ষা করিয়া, চুরি করিয়া, হিতাহিতজ্ঞান-শূন্য হইয়া তাহাই আমরা কিনিতেছি। তাই পেখমের মত বৈচিত্র্য, আজিকার পেখম কাল অচল। বাজারে এক জিনিস চিরকাল চলে না। বুদ্ধিই পেখম কিনিবার পরামর্শ দিতেছে, বুদ্ধিই পেখমের কারখানা খুলিয়াছে, এই বুদ্ধি-মহাজনের পদপ্রান্তে আমরা দাসখৎ লিখিয়া দিয়াছি।

ক্রমশই উত্তেজিত হইয়া পড়িতেছিলাম।

আরও কিছুক্ষণ এই গ্রামে চিন্তা করিলে কি হইত বলা যায় না। হঠাৎ শ্যামবাবুর নূতন মোটরখানা সবেগে ধূলা উড়াইয়া চলিয়া যাওয়াতে চিন্তা ভিন্ন পথ ধরিল। শ্যামবাবু মোটরখানা অল্প কয়েকদিন হইল কিনিয়াছেন। পিছন দিকটা একটু বোঁচা গোছের, কিন্তু নূতন মডেল। আগেকার গাড়িটা ঠিকই ছিল, কিন্তু নূতন মডেলের লোভ সম্বরণ করা শ্যামবাবুর পক্ষে শক্ত। শ্যামবাবু লোকটি হালে বড়লোক হইয়াছেন, এবং সেইজন্যই সম্ভবত হালে পানি পাইতেছেন না। কি করিলে যে আত্মপ্রচারটা সর্ব্বতোমুখী হইবে, কিছুতেই যেন ঠিক করিতে পারিতেছেন না। সর্ব্বদাই অপ্রকৃতিস্থ। নিত্যনূতন মোটর, নিত্যনূতন রেডিও, নিত্যনূতন পোষাক, নিত্যনূতন বাড়ী, নিত্যনূতন নারী, নিত্যনূতন মদ, নিত্যনূতন ব্যাধি, প্রতিদিন নিত্যনূতন প্রকাশ। আমাদের নিবারণবাবুরাও বড়লোক। কিন্তু বনিয়াদী ঘর, বাড়াবাড়ি নাই। সাবেক কালের ল্যাণ্ডোতে

চড়িয়াই বেড়াইয়া থাকেন, বৈঠকখানায় ঢালা ফরাসের বন্দোবস্ত পুরাতন চকমিলানো বাড়ির সাবেক মূর্ত্তি, দরজা-জানালাগুলি পর্য্যন্ত সেকেলে। আচার-ব্যবহার চালচলন কোন কিছুতেই আধুনিকতার ছাপ পড়ে নাই। সহসা মনে হইল, জীব-জগতে মানুষও তো সেদিন মাত্র ভূমিষ্ঠ হইয়াছে। বটগাছের মত সে তো বনিয়াদী নয়। বটগাছ প্রতি বৎসর একই ধরণের সনাতন সবুজ পাতায় সাজিতে ইতস্তত করে না, তাহার সাবেক চাল অব্যাহত আছে, কারণ তাহার ঐশ্বর্য্য বনিয়াদী। তাহার তুলনায় মানুষ তো সত্যই অতি-আধুনিক। ভূইফোঁড় শ্যামবাবুর মত নিত্যনূতন দামামা বাজাইয়া সে নিজেকে হাজির করিবে না তো কে করিবে? ইহাই যে তাহার স্বধর্ম্ম। কিম্বা হয়তো—দূর ছাই, আর ভাবিতে পারি না। 'হয়তো' আর 'নয়তো'র দ্বন্দ্ব মিটানো আমার কর্ম্ম নয়। ভুতোকে তামাক দিতে বলিলাম।

দৌহিত্র পুনঃপ্রবেশ করিলেন ও বলিলেন, ত্রিপুরাবাবু মারা গেলেন। আমার সেই মুসোলিনি-ভক্ত বন্ধুটি কিছুদিন যাবৎ ভুগিতেছিলেন। বন্ধুর মৃত্যু-সংবাদে ব্যথিত হইলাম। ত্রিপুরাচরণ চিন্তায় কর্ম্মে অতি-আধুনিক ছিলেন। সনাতন মৃত্যুর হাত কিন্তু এড়াইতে পারিলেন না। ভুতো তামাক দিয়া গেল। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া একটা সুদীর্ঘ দার্শনিক টান দিলাম।